দারসে কুরআন সিরিজ-১৭

যুক্তির কষ্টিপাথরে
আল্লাহর অস্তিত্ব

৭

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-১৭

যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৮
পঁচিশতম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০১৪

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশদাশ লেন,
ঢাকা-১১০০ ।

মূল্য ঃ ৯০.০০ (নব্বই) টাকা মাত্র ।

www.pathagar.com

প্রারম্ভিক কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ - অর্থাৎ 'কিছু মানুষ আছে যারা জ্ঞানের সদ্ব্যবহার ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়।' (সূরা হজ্জ ঃ ৪) - وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ অর্থাৎ 'তারা (মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও) ইসলামের শত্রুদেরই অনুসরণ করে চলেছে।'

তারা যে চিন্তাবিভ্রাটে ভুগছেন তা দূর করার নিয়তে এ ছোট্ট বইখানা লেখার প্রয়োজন বোধ করেছি। তবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ *
لَقَالُوْا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ *

(الحجر- ١٥-١٤)

অর্থ ঃ এবং তাদের জন্য যদি আকাশের দরজা খুলেও দেই, আর তারা সেখানে আরোহণও করতে পারে অর্থাৎ তারা যদি আকাশে আকাশযানে চলাফেরাও করতে পারে তবু তারা বলে উঠবে, আমাদের চোখ বিভ্রান্ত হচ্ছে, আমাদের চোখের উপর কেউ যাদু করেছে।

তারা ঈমান আনবে না। তাদের সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। তবে তাদের নিকট আমার একটি প্রশ্ন রইলো, তা হচ্ছে এই যে, খবর যা রটে তা সত্য অথবা মিথ্যা এর যেকোনো একটা হয়-ই। সুতরাং নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে আমরা যে খবর শুনে আসছি তা হয় সত্য অথবা মিথ্যা এর যেকোনো একটা হবেই। যদি এ খবর মিথ্যা হয় তবে তো সবাই বেঁচে গেলাম। কিন্তু যদি তা সত্যি হয় তাহলে?

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * (الواقعة - ٢-١)

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যখন সেই মহা ঘটনা ঘটবেই যা আদৌ মিথ্যা নয়।

তখন বিশ্বাসীদের তো বাঁচার একটা পথ হবে। অবিশ্বাসীদের তখন কি উপায় হবে? এ প্রশ্নটার উপর আমি চিন্তা করতে বলবো তাদেরকে যারা পরকাল ও আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা-বিভ্রাটে ভুগছেন।

শিক্ষিত সমাজের মন-মস্তিষ্ক

যারা বর্তমান সমাজের মন-মস্তিষ্ক সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না তাদের অবগতির জন্য এখন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি, যার থেকে তারা বর্তমান শিক্ষিত সমাজের একটা শ্রেণীর মন-মস্তিষ্ক সম্পর্কে অনুমান করতে পারবেন যে, এই মুহূর্তে এ বইটা লেখার ও প্রচারের কত প্রয়োজন। যথা ঃ

১. একদিন এক ভদ্রলোক বলছিলেন, ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত লেখাপড়া করলাম, এর মধ্যে কোথাও এমন কিছু পেলাম না যার মধ্যে আল্লাহকে বিশ্বাস করার মতো কোনো যুক্তি আছে। বরং আল্লাহকে অস্বীকার করার মতো ভুরি ভুরি যুক্তি পেয়েছি আমরা।

২. একদিন এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একজন গ্রাজুয়েট কন্ট্রাক্টরের মুখে 'ইন্‌শাআল্লাহ' শুনে কন্ট্রাক্টরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি এই বিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত লোক হয়ে এখনো আল্লাহকে মানেন?

৩. বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের ছাপা একখানা বই আমার হাতে পড়লো যার মধ্যে লেখা রয়েছে– 'ধর্ম অন্ধযুগের কুসংস্কার....! ধর্মের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন বিজ্ঞানের যুগ ...। এখন কল্পিত আল্লাহয় বিশ্বাসের আর কোনো প্রয়োজন নেই।' এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত সমাজের একশ্রেণীর ধ্যান-ধারণা।

যাদের এমন ধ্যান-ধারণা তারা অত্যন্ত সুচতুরতার সঙ্গে তাদের 'আল্লাহ নেই' মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। এমনকি এই 'আল্লাহ নেই' মতবাদের ভিত্তিতে এদেশে রাজনৈতিক দলও গড়ে উঠেছে এবং তারা মুসলমানদের কিছু কিছু ভোটও পাচ্ছে।

এ অবস্থায় আল্লাহবিশ্বাসীদের বুঝা উচিত যে, ইসলাম ও নাস্তিক্যবাদের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে তখন একই দেশে একই

www.pathagar.com

সঙ্গে দু'টি মতবাদ চলতে পারে না। চলবে মাত্র একটি, হয় ইসলাম নতুবা নাস্তিক্যবাদ।

দুই দলে যখন যুদ্ধ লেগে যায় তখন একদল যদি অস্ত্র ছেড়ে দেয় তবে অন্য দলের জয় যেমন সুনিশ্চিত তেমনি এই মুহূর্তে যখন লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করা হচ্ছে তখন যদি ইসলামপন্থীরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় তাহলে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা যে চীন-রাশিয়ার মতো হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে কি?

উক্ত বিষয় চিন্তা-ভাবনা করেই এ বইটা লেখার কাজে হাত দিয়েছি। এখন মুসলমানদের উচিত সকল ধরনের মতবিরোধ বাদ দিয়ে নাস্তিক্যবাদের খপ্পর থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা এবং অকাট্য যুক্তি দ্বারা নাস্তিকতার ভিত্তিহীন যুক্তিগুলো খণ্ডন করে দেয়া। আশা করি দ্বীনদরদী মুসলমানরা আমার এ কথাগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করবেন।

অতঃপর নাস্তিকদের প্রতি আমার আহ্বান এই যে, এই ছোট্ট বইয়ে উত্থাপিত যুক্তিগুলো খণ্ডন করার মতো কোনো যুক্তি আপনাদের কাছে থাকলে তা আমার মতো বই আকারে প্রকাশ করে দিন। সমাজ আপনার যুক্তি ও আমার যুক্তি একত্রে পড়বে ও তাদের নিকট যা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হবে তা তারা গ্রহণ করবে। আর সেইসাথে আপনারাও এ বইটা পড়ুন, যদি আপনার মগজে সত্য ধরা গড়ে তাহলে আপনি নিজেও পরপারের অনন্তকালের জীবনকে হয়তবা বিপদমুক্ত করতে সক্ষম হবেন। এই আশা নিয়েই আমার এ বইটা আপনাদের কাছে পেশ করলাম।

৩১ আগস্ট ১৯৮৮ ইং — গ্রন্থকার

www.pathagar.com

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব' শিরোনামের এই বইখানার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠক ও পাঠিকাদের পরামর্শক্রমে বর্তমান সংস্করণকে 'দারসে কুরআন' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। কারণ এর যুক্তিগুলো সব-ই কুরআনভিত্তিক। এর সঙ্গে আরও কিছু অতিরিক্ত কথা জুড়ে দেয়া হলো। বিশেষকরে অতি সম্প্রতি একখানা বই বের হয়েছে। সে বই পড়ে দেখলাম তাতে ৫৭টা এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যার প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে অস্বীকার করানোর যুক্তি দাঁড় করানো।

উক্ত বই পাঠ করে 'মাওলানা ফারুক' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র নাকি নামায ছেড়ে দিয়েছে!

এতে বুঝা যাচ্ছে লেখকের চেষ্টা সার্থক হয়েছে। তার প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো ফারায়েজের কিতাবে ওয়ারিসগণের মধ্যে অংশ ভাগ করে দেয়ার ব্যাপারে এক জায়গায় নাকি আল্লাহ অংকে গরমিল করে ফেলেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

উক্ত বিষয়কে উল্লেখ করে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে আল্লাহ কি অংকশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ?

আমি সে বইটার মধ্য থেকে ঐ একটা প্রশ্নেরই মাত্র উত্তব দেয়ার চেষ্টা করেছি এ সংস্করণে। তাতে দেখানোর চেষ্টা করেছি আল্লাহ কি কি অংক জানেন। অবশ্য আমার ক্ষুদ্র মাথায় কতটুকুইবা আল্লাহর অংক জানার খোঁজ রাখা সম্ভব। তবু যা যৎকিঞ্চিৎ খোঁজ রাখি তারই কিছু এর মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। যদিও বিষয়টা খুব নিম্নমানের এবং এসব ছোট কথায় কান দেয়া ঠিক নয় তবু ছাত্রদের বিভ্রান্ত হওয়ার খবর শুনে এতে হাত দিয়েছি।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার আবেদন, আপনারা যারা সত্যিকার অর্থে পরকালে বিশ্বাসী তাদের হয়ত জানা আছে যে, বর্তমানে দেশে নাস্তিকদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং তা বাড়ছে আমাদেরই ছেলে-মেয়েদের মধ্য থেকে।

www.pathagar.com

যদিও আমরা বেহেশত-দোযখ চোখে দেখছি না, কিন্তু বিশ্বাসের যখন কোনো ঘাটতি নেই তখন তারা না বুঝলেও আমরা তো বুঝি যে, আমাদেরই প্রাণপ্রিয় ছেলে-মেয়েরা সেই জাহান্নামের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জাহান্নামগামী করার চেষ্টা করছে। এসব বুঝার পর আমরা কি করে তাদের অনিবার্য ধ্বংস মেনে নিতে পারি? আমরা তো এমন মনের অধিকারী যে, যেকোনো ব্যক্তিকে সামান্য একটু কষ্ট পেতে দেখলেই আমরা তার জন্য ব্যথিত হয়ে পড়ি। এই মন নিয়েই যখন বুঝি যে কিছু লোক চিরস্থায়ী বসবাসের জন্যে জাহান্নামের দিকে ছুটে যাচ্ছে তখন তাদের জন্য কি এই মনে ব্যথা লাগার কথা নয়? যদি সত্যিই তা লেগে থাকে তবে আমাদের উচিত হবে তাদেরকে ফেরানো।

এ ফিরানো গায়ের জোরে হবে না, ফিরাতে হবে তাদের জ্ঞানের কাছে যুক্তির মাধ্যমে আপীল করে। এই উদ্দেশ্যেই আমি আমার সাধ্যানুযায়ী এ পুস্তকখানায় চেষ্টা করেছি।

অতঃপর সমস্ত ঈমানদার ভাইদের প্রতি আমার বিশেষ আবেদন, এই বইখানা আপনি ভালো করে পড়ুন। পড়ে যদি বুঝেন যে নাস্তিকতা দূর করতে বইখানা সাহায্য করবে তাহলে পরিকল্পিতভাবে যুবক ছেলেদের পড়তে দিন, তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনায় বসুন। খুব ঠাণ্ডা মেজাজে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে লোকদেরকে সত্য বুঝানোর চেষ্টা করুন। কোথাও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, কোথাও বই পড়িয়ে যেখানে যেভাবে যুক্তিসঙ্গত হয় সেখানে সেইভাবে চেষ্টা করে যাওয়া আমি মনে করি ঈমানদার ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় নৈতিক দায়িত্ব।

আমার মনের ইচ্ছা যে, এ ধরনের বই আরও বাজারে আসুক এবং তা অনুবাদ হয়ে চীন-রাশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ুক এবং তামাম বনি আদম আল্লাহর পথে ফিরে আসুক।

আশা করি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে আমরা আমাদের যার যার নিজের স্বার্থেই আল্লাহকে চিনতে চেষ্টা করবো এবং নিজের স্বার্থেই আসুন আরেকবার ভেবে দেখবো আল্লাহকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন আছে কি নেই। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

১লা ডিসেম্বর ১৯৯২ইং

-গ্রন্থকার

www.pathagar.com

সূচীক্রম

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
আল-কুরআনের বাণী	১১
বাংলা অনুবাদ	১২
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	১৪
নাস্তিক্যবাদের উৎস	২৩
নাস্তিকদের যুক্তি	২৫
বিবেকের জবাব	২৫
সাক্ষ্য থেকে বিশ্বাস	২৭
আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে কুরআনভিত্তিক যুক্তিসমূহ	
১ নং যুক্তি ঃ নাস্তিক বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী যেভাবে সৃষ্টি এবং আল্লাহর মতে পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি	৩০
পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী	৩৩
২ নং যুক্তি ঃ নাস্তিক বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মানুষ বনাম আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ	৩৫
৩ নং যুক্তি ঃ মানুষের জন্মবৃত্তান্ত	৩৭
বাস্তবতাবিরোধী যুক্তি	৩৮
৪ নং যুক্তি ঃ দিন-রাত ও চাঁদ-সূর্য মানুষের সেবায় নিয়োজিত	৩৯
৫ নং যুক্তি ঃ দিন ও রাত এবং ঋতুর পরিবর্তন	৪২
দুই মাশরিক ও দুই মাগরিব	৪৫
৬ নং যুক্তি ঃ গ্রহগুলোর কক্ষপথের অবস্থা	৪৬
৭ নং যুক্তি ঃ রাত এবং দিনের বাড়া ও কমা	৪৮
৮ নং যুক্তি ঃ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি	৪৮
৯ নং যুক্তি ঃ সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব সম্পর্কে	৫২
চান্দ্রমাসের হাকীকত	৫৩
১০ নং যুক্তি ঃ সমুদ্রের পানিতে লবণের ভাণ্ডার	৫৩
১১ নং যুক্তি ঃ বাতাসের মধ্যে গাছের খাদ্য	৫৪
১২ নং যুক্তি ঃ আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাহিনী	৫৫
বিস্তারিত ব্যাখ্যা	৫৮
কুরআন ও বিজ্ঞানে সবক্ষেত্রে টক্কর নেই	৬০

www.pathagar.com

পৃথিবী কি সূর্য থেকে সৃষ্ট ৬১
১৩ নং যুক্তি ঃ সবকিছুই আল্লাহর ভাণ্ডারে ৬৫
মানুষের খাদ্য সমুদ্রে ৬৮
১৪ নং যুক্তি ঃ আল্লাহ পাকের সৃষ্টিনিয়ন্ত্রণ ৬৯
১৫ নং যুক্তি ঃ ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ ৭০
বানরের লেজ খসে মানুষ ৭১
১৬ নং যুক্তি ঃ জীবের বৈশিষ্ট্য ৭৩
ক) জীবের চেহারা-সুরত ৭৩
খ) দৃষ্টিশক্তি ৭৩
গ) গলার আওয়াজ ও শ্রবণশক্তি ৭৪
১৭ নং যুক্তি ঃ আকাশের ভাসমান মেঘের হাকীকত ৭৫
১৮ নং যুক্তি ঃ মেঘের পানি সম্পর্কে ৭৬
১৯ নং যুক্তি ঃ পাকস্থলী সম্পর্কে ৭৭
২০ নং যুক্তি ঃ জিহ্বার কার্য ৭৮
২১ নং যুক্তি ঃ বায়ুর মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ ৮০
২২ নং যুক্তি ঃ শ্বাসযন্ত্র ৮০
২৩ নং যুক্তি ঃ হার্ট ও শিরা-উপশিরার কার্যকলাপ ৮১
২৪ নং যুক্তি ঃ স্বপ্ন ৮১
২৫ নং যুক্তি ঃ গাছের মধ্যে আল্লাহর তৈরি কারখানা ৮৩
২৬ নং যুক্তি ঃ গাছে সম্পদ ৮৪
২৭ নং যুক্তি ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ৮৪
২৮ নং যুক্তি ঃ বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন গুণাগুণ ৮৫
২৯ নং যুক্তি ঃ পানি ও মাটির মিত্রতা ৮৫
৩০ নং যুক্তি ঃ সম্পদ বণ্টনে আল্লাহর বিধান ৮৫
৩১ নং যুক্তি ঃ পশুর মধ্যে খাদ্য বস্ত্র ও বিভিন্ন প্রকার উপকারিতা ৮৬
৩২ নং যুক্তি ঃ পশুর পেটে দুধের কারখানা ৮৭
৩৩ নং যুক্তি ঃ মৌমাছির পেটে মধুর কারখানা ৮৭
৩৪ নং যুক্তি ঃ গাছ থেকে জীবের খাদ্য ও জীব থেকে গাছের খাদ্য ৮৮
৩৫ নং যুক্তি ঃ বিভিন্ন প্রকার গাছে টিকে থাকার ব্যবস্থা ৮৯
৩৬ নং যুক্তি ঃ ছোট প্রাণীর বাঁচার ও টিকে থাকার ব্যবস্থা ৮৯
৩৭ নং যুক্তি ঃ গাছের প্রজনন ৯২
৩৮ নং যুক্তি ঃ মানব সন্তান কেন অসহায় ৯২
৩৯ নং যুক্তি ঃ জীবন ধারণের প্রধান উপাদান কোনো সম্পদ নয় ৯৩

www.pathagar.com

৪০ নং যুক্তি ঃ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই আল্লাহবিশ্বাসের অনুকূলে ৯৪
৪১ নং যুক্তি ঃ আল্লাহর সূক্ষ্ম হিসাব ৯৫
আল্লাহর জানা অংকগুলোর কয়েকটি ৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামই একমাত্র ধর্ম ১০১
ধর্মীয় ব্যাপারে আমার চিন্তাধারা ১০৩
সব ধর্মই কি ঠিক ১০৪
কয়েকটি ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাসীদের ঐকমত্য ১০৫
পরকালে মুক্তির পথ একটাই ১০৬
আল্লাহর ধর্ম সকলের নিজের ধর্ম ১০৭
অন্যান্য ধর্ম সৃষ্টি হলো কি করে ১০৭
'ইসলাম' একমাত্র খাঁটি ধর্ম ১০৯
১ নং যুক্তি ঃ ধর্মের নামকরণের সার্বজনীনতা ১০৯
২ নং যুক্তি ঃ ধর্মকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে ১১০
৩ নং যুক্তি ঃ ধর্মীয় আইন হতে হবে নির্ভুল ১১১
৪ নং যুক্তি ঃ ধর্মীয় বিধান পক্ষপাতহীন হতে হবে ১১১
৫ নং যুক্তি ঃ পৈতৃক ধর্মের চেয়ে অধিক যুক্তিগ্রাহ্য
না হলে কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে না ১১৩
৬ নং যুক্তি ঃ ধর্মীয় গুরু ব্যক্তিগণকে হতে হবে সবার জন্য আদর্শ ১১৪
৭ নং যুক্তি ঃ আল-কুরআনই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য
ও বিজ্ঞানসম্মত ধর্মগ্রন্থ ১১৪
৮ নং যুক্তি ঃ ধর্মের দৃষ্টিতে সাধু ব্যক্তি ১১৬
একটি প্রশ্ন ঃ একটি চিন্তায় বিষয় ১১৭
আরেকটি চিন্তার বিষয় ১২৯
শিক্ষিত হিন্দু ভাইদের প্রতি একটি নিবেদন ১২০

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন আল্লাহর বাণী ১২১
এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল ১২১

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষের দাবিতেই পরকাল ১২৪
পরকাল যে সত্যিই হবে তার যুক্তি ১২৪
সৃষ্টির চাহিদা পূরণই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান ১২৫
উপসংহার ১২৮

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আল-কুরআনের বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ * وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ق مِّنَ الْاَرْضِ ق اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ * وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ * وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

www.pathagar.com

বাংলা অনুবাদ

তার নিদর্শনের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা সহসা মানুষ হয়ে জমিনে ছড়িয়ে পড়তেছো। তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতির মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে বিপুল নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে। আর তার নির্দশনসমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহের ও জমিনের সৃষ্টি (কৌশল)। আর তোমাদের বিভিন্ন ভাষা ও তোমাদের বর্ণের পার্থক্য। বস্তুতঃ এর মধ্যেও রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন। আর তার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনের বেলায় নিদ্রা যাওয়া এবং তোমাদের তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা। এর মধ্যেও রয়েছে বহু নিদর্শন তাদের জন্য যারা (মনোযোগ সহকারে) শোনে। আর তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখান ভয় সহকারে এবং আশা বা লোভ সহকারে। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করান। পরে তার সাহায্যে জমিনকে তার মৃত্যুর পর জিন্দা করে তোলেন। অবশ্যই এসবের মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন তাদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। তার বহু নিদর্শনের মধ্যে এটাও একটি যে, আসমান ও জমিন তারই হুকুমে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পরে যখনই তিনি তোমাদের জমিন হতে আহ্বান করবেন শুধুমাত্র একটিবারের আহ্বানেই তোমরা সহসা বের হয়ে আসবে। আকাশ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তার অনুগত ও ফরমাবরদার। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন। আর এটা তার জন্য খুবই সহজ কাজ। আসমান ও জমিনে তার গুণাবলী সর্বোত্তম এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।

(সূরা রূম ঃ ২০-২৭)

শব্দার্থ ঃ وَ – এবং। مِنْ – হতে। اٰيٰتِ – নিদর্শন। هٖ – তার (আল্লাহর)। اَنْ – যে। خَلَقَكُمْ – তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। مِّنْ – হতে। تُرَابٍ – মাটি। ثُمَّ – পুনরায়। اِذَا – যখন। اَنْتُمْ – তোমরা।

www.pathagar.com

بَشَرٌ – মানুষ। تَنْتَشِرُوْنَ – (জমিনে) ছড়িয়ে পড়তেছো। خَلَقَ – সৃষ্টি করেছেন। لَكُمْ – তোমাদের জন্য। مِنْ اَنْفُسِكُمْ – তোমাদের মধ্য হতে। اَزْوَاجًا – স্ত্রীগণ। لِّتَسْكُنُوْا – যেন তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পারো। اِلَيْهَا – তার (স্ত্রীর) কাছ থেকে। جَعَلَ – তিনি করেছেন। بَيْنَكُمْ – তোমাদের পরস্পরের মধ্যে। مَوَدَّةً – ভালোবাসা। رَحْمَةً – দয়া, অনুকম্পা বা হৃদ্যতা। اِنَّ – নিশ্চয়ই। فِىْ – মধ্যে। ذٰلِكَ – এর। لَاٰيٰتٍ – অবশ্য নিদর্শন রয়েছে। لِقَوْمٍ – (সেই) সম্প্রদায়ের জন্য। يَتَفَكَّرُوْنَ – (যারা) চিন্তা-ভাবনা করে। وَاخْتِلَافُ – এবং বিভিন্নতায়। اَلْسِنَتِكُمْ – তোমাদের ভাষার। وَاَلْوَانِكُمْ – এবং তোমাদের (গায়ের) রং-এর। لِلْعٰلِمِيْنَ – বিদ্বানদের জন্য। مَنَامُكُمْ – তোমাদের ঘুম। بِالَّيْلِ – রাতের বেলা। وَالنَّهَارِ – এবং দিনের বেলা। يَسْمَعُوْنَ – (যারা মনোযোগ দিয়ে) শোনে। يُرِيْكُمْ – তিনি দেখান তোমাদের। بَرْقُ – বিজলীর চমক। خَوْفًا – ভয় সহকারে। وَ – এবং طَمَعًا – আশা বা লোভ সহকারে। يُنَزِّلُ – তিনি নাযিল করেন। مِنَ السَّمَاءِ – আকাশ হতে। مَاءً – পানি। فَيُحْىٖ – অতঃপর জিন্দা করেন। بِهٖ – এর দ্বারা। الْاَرْضَ – জমিনকে। بَعْدَ – পরে। مَوْتِهَا – এর মৃত্যুর। এখানে মাটির মৃত্যু থেকে মাটির অনুর্বরতা বুঝানো হয়েছে। يَعْقِلُوْنَ – যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এবং তা কাজে লাগায়। تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ – আসমান ও জমিনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা। তার হুকুমে (বিনা খুঁটিতে)। ثُمَّ – অতঃপর। اِذَا – যখন। دَعَاكُمْ – তিনি

www.pathagar.com

তোমাদের ডাক দিবেন। دَعْوَةً – একমাত্র ডাকে। مِنَ الْاَرْضِ – জমিন হতে। تَخْرُجُوْنَ – তোমরা বের হয়ে আসবে। وَلَهٗ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ – আসমান ও জমিনের সবকিছুরই মালিকানা তার। كُلٌّ – সবকিছুই। لَهٗ – তার জন্য। قٰنِتُوْنَ – অনুগত। الَّذِىْ – যিনি। يَبْدَؤُ الْخَلْقَ – সৃষ্টির সবকিছুকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন। ثُمَّ – পুনরায়। يُعِيْدُهٗ – তা পুনঃসৃষ্টি করবেন। اَهْوَنُ – অতি সহজ। عَلَيْهِ – তার জন্য। اَلْعَزِيْزُ – মহা শক্তিধর। اَلْحَكِيْمُ – মহাজ্ঞানী।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নিজেই তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক যুক্তি হাজির করেছেন। তার মধ্যে সূরা রূমের উপরিউক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে পরপর কয়েকটি যুক্তি এখানে হাজির করেছেন–যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো। এরপর গোটা বইটার মধ্যে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ এরই পরিপূরক আরও কিছু বুদ্ধি ও জ্ঞানগ্রাহ্য যুক্তি। এখানে বলা হয়েছে ঃ

১. মানুষকে প্রথমে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর মাটির পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ সেই মাটির পৃথিবীর সবকিছুই ভোগ করছে। সেই মাটির সঙ্গেই রয়েছে আমাদের গভীর সম্পর্কে। সে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না মৃত্যুর পরও এবং পুনরুত্থানের পরও। এর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু শিক্ষা–বলছেন আল্লাহ নিজেই।

২. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীজাতিকে যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে তোমাদের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের সূচনা করে এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন মহব্বত ও হৃদ্যতা, আর তাদের নিকট থেকে পাও পরম প্রশান্তি যার কারণে সংসার জীবনের ভিত্তি হয় মজবুত। এর মধ্যেও রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয়।

৩. এরপর আল্লাহ চিন্তা করতে বলেছেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে। যার ব্যাখ্যা অত্র বইয়ের পরবর্তী অংশে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আর এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আমাদের ভাষা ও গায়ের বর্ণের বিভিন্নতা সম্পর্কে চিন্তা করতে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবার গায়ের রং এবং মুখের ভাষা একই রকম করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার পিছনে যে আল্লাহর কি হেকমত রয়েছে (যা পরে আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ) তা মানুষ চিন্তা করলে অবশ্যই তার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় খুঁজে পাবে।

৪. আল্লাহ চিন্তা করতে বলেছেন রাতে ও দিনে মানুষ যে ঘুমায় সে বিষয়টি নিয়ে। যাদেরকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন, জাগ্রত অবস্থায় তাদের মাথায় কোনো না কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকেই। এতে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো থাকে সক্রিয়। ফলে তা একভাবে চলতে থাকায় মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো ক্লান্ত ও অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এটাকে পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্য আল্লাহ মানুষের ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন। এর মধ্যেও রয়েছে আল্লাহকে চেনার জন্য বড় ধরনের নিদর্শন।

৫. বলা হয়েছে, বিদ্যুতের চমকের মধ্যে রয়েছে ভয় এবং লোভনীয় কিছু। লোভনীয় কিছুরই অর্থ হলো লাভজনক কিছু। কিন্তু সেটা কি? এরপর বলা হয়েছে যার দ্বারা অনুর্বর জমিকে উর্বর করে গড়ে তুলি। এটা যে কি তা এবার আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। তা হচ্ছে গাছের খোরাক। বিদ্যুতের চমকে মহাশূন্যের নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং এক একবারের চমকে হাজার হাজার টন নাইট্রেট সৃষ্টি হয়ে তা পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এর মাধ্যমেই আল্লাহ অনুর্বর জমিকে উর্বর করে গড়ে তোলেন। সুতরাং আমরা দেখি বৃষ্টির পানিতে বিনা সারে ফসল ফলে। আর মাটির নিচের পানির সাথে বহু টাকার সার দেয়া লাগে।

আমাদেরকে আল্লাহ আলো, বায়ু ও পানি–যা না হলে জীবন রক্ষা সম্ভব নয়–এগুলোকে যেমন কেনার বস্তু বানাননি ঠিক তেমনি সাধারণভাবে ফসল ফলানোর জন্য আকাশে রক্ষিত হাজার হাজার টন গাছের খোরাকও কেনার মতো সম্পদে পরিণত করেননি। যেন আমরা সহজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রুজি পেতে পারি। এর মধ্যেও রয়েছে আল্লাহকে চেনার মতো বহু নিদর্শন।

৬. আর আসমান ও জমিন মহাশূন্যের মধ্যে বিনা খুঁটিতে শূন্যে ভর করে রয়েছে। এই বিরাট ওজনের পৃথিবীটাকে শূন্যে ভর করে কিভাবে

www.pathagar.com

আল্লাহ রেখেছেন এই একটা মাত্র বিষয়ের উপর চিন্তা করলে কেউই নাস্তিক থাকতে পারে না। আর তা রয়েছে চালু অবস্থায়। যে বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি কুরআন নাযিলের বহু পরে। এরমধ্যেও রয়েছে আল্লাহকে চেনার মতো বহু নিদর্শন। এভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করতে যিনি সক্ষম তিনিই একদিন ডাক দিবেন কবর থেকে বেরিয়ে আসতে। আর প্রত্যেকেই আল্লাহর ডাকে জমিনের ভিতর থেকে জিন্দা হয়ে বেরিয়ে পড়বে। একদিন যেমন আমরা মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে এসেছি ঠিক তেমনিভাবে একদিন আমরা বেরিয়ে আসবো জমিনের ভিতর থেকে।

এর প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর যে কেউই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবেন তারই মাথায় ধরা পড়বে আল্লাহর অস্তিত্বের যুক্তি।

এছাড়া এই সূরা রুমেরই ১ম আয়াতে আল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, রোম আজ হেরে গেল, কিন্তু এই রোমই ৯ বছরের মধ্যে পুনরায় আহলে কিতাবদের দখলে আসবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে অনেকের মধ্যে আবু জেহেল হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে বাজি ধরেছিল যে, যদি তা সত্যি হয় তবে আমি ১০০ শত উট দিবো।

পরে ৯ বছরের মধ্যে যখন রোম পুনরুদ্ধার হলো তখন আবু জেহেলের নিকট থেকে ১০০ শত উট আদায় করা হয়েছিল–যা ঐতিহাসিক সত্য এবং তা বায়তুলমালে জমা দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহর অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করে তারা এ বাস্তব ঘটনার কি ব্যাখ্যা দিতে পারবে? আর ৯ম হিজরীর হজ্জের মাঠে সূরা 'নসর' নাযিল হওয়ার পর যখন রাসূল (সা) আল্লাহর নিকট থেকে ভবিষ্যদ্বাণী পেয়ে গেলেন যে, তাঁর দুনিয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

তখন তিনি সেই হজ্জের মাঠের উপস্থিত মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন–'সূরা নসর নাযিল হয়েছে তোমরা তা শোনো। আমার মৃত্যুর সংবাদ এসে গেছে। আমাকে সামনের হজ্জে আর পাবে না। সুতরাং আমার জীবনের শেষ হেদায়াত তোমরা গ্রহণ করো।'

তিনি উটের পিঠের উপর বসে প্রায় সোয়া লাখ মুসলমানের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন সেই ভাষণই হচ্ছে ঐতিহাসিক 'বিদায় হজ্জের ভাষণ।' আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর না পেলে দুনিয়ার কোন মানুষটা বলতে পারে যে,

www.pathagar.com

আর এক বছর পরে আমাকে পাবে না। আর ইতিহাস থেকে এটা কেউই কি প্রমাণ করতে পারবে যে অমুক সুস্থ ব্যক্তি কোনো বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, এটাই আমার জীবনের শেষ বক্তৃতা এবং সামনের বছর এই মাস পর্যন্ত আমি বাঁচবো না?

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণের কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাবে কি? আল্লাহকে স্বীকার করার জন্য এর যেকোনো একটি মাত্র বিষয়ই যথেষ্ট। তবু লক্ষ্য করুন আল্লাহর আরও কয়েকটি বাণীর প্রতি। পড়ুন নিম্নের আয়াতগুলো। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের আরও ২১ স্থান থেকে কিছু আয়াত অর্থসহ এখানে তুলে ধরা হলো। যার প্রত্যেকটিই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ করবে। যথা ঃ

١- يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ *

১. যাকিছু আকাশে রয়েছে এবং যাকিছু জমিনে রয়েছে তার প্রত্যেকটির সৃষ্টিকৌশলই আল্লাহর অস্তিত্বের ঘোষণা করছে। যিনি রাজাধিরাজ, মহা পবিত্র, পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী। (সূরা জুমুআ ঃ ১)

٢- يٰسٓ * وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ * اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ *

২. হে রাসূল! শপথ এই বিজ্ঞানময় কুরআনের (যে কুরআনের বৈজ্ঞানিক আয়াতসমূহই প্রমাণ করবে যে) নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইয়াসীন ঃ ১–৩)

٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط

৩. তুমি কি দেখো না যে আল্লাহ আসমান ও জমিনকে কিভাবে সঠিক ও যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন? (সূরা ইবরাহীম ঃ ১৯)

٤- مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ *

www.pathagar.com

৪. তুমি দয়ালু আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোনো অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি পাবে না। তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো এ বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি। দেখো, কোথাও কোনো টুটাফাটা বা অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি পাচ্ছো কি? (সূরা আল-মুলক ঃ ৩)

٥- اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا *

৫. মানুষের কি এ কথা মনে পড়ে না যে আমি তাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছি যখন তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। (সূরা মরিয়াম ঃ ৬৭)

٦- اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ *

৬. নিশ্চয় তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন। (সূরা আল-বুরূজ ঃ ১৩)

٧- اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ *

৭. তারা কি চিন্তা করে দেখে না যে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির কাজ শুরু করেন আর কিভাবে তার পুনরাবর্তন ঘটান। আর এটা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত সহজ কাজ। (সূরা আনকাবুত ঃ ১৯)

٨- اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ *

৮. যিনি আসমান ও জমিন আপন শক্তিবলে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তা পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? অবশ্যই সক্ষম। তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৮১)

٩- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ * ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ *

৯. তোমরা কি কখনো চিন্তা-গবেষণা করে দেখেছো যে, তোমরা যে শুক্র নিক্ষেপ করো তার দিকে? তোমরা কি তার থেকে সন্তান সৃষ্টি করতে পারো, না আমি তা করে থাকি? (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৫৮-৫৯)

www.pathagar.com

আরবের সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন ঃ

١٠- اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * (الغاشية *

১০. তোমরা কি দেখো না যে উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে[১] এবং আকাশকে কিভাবে উর্ধ্বে তুলে দেয়া হয়েছে এবং পাহাড়-পর্বতগুলোকে দেখো না কিভাবে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। আর পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করে কি দেখো না যে তা কিভাবে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

(সূরা আল-গাশিয়াহ ঃ ১৭-২০)

١١- كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ *

১১. তোমরা কি করে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারো। অথচ তোমরা প্রথমে মায়ের পেটে ছিলে মৃত অবস্থায়, তারপর আমি তোমাদেরকে জীবিত করলাম। এরপর সেই আল্লাহই তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং তিনিই তোমাদের পুনরায় জীবিত করবেন। অতঃপর তারই দিকে তোমাদের (জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করার জন্য) ফিরে যেতে হবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮)

টীকা–১ ঃ ১. উটকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন মরুভূমির মধ্যে যেখানে পানির অভাবে কষ্ট পাবে সেখানে কয়েক দিনের পানি একদিনে পান করে পেটের মধ্যে জমা করে রাখতে পারে। ২. আকাশকে এত উপরে রেখেছেন যে, যে 'কুয়েজার' নামক তারকা পৃথিবী থেকে ১৮শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে সে তারকাও প্রথম আসমানের নিচে অবস্থিত। ৩. পাহাড়-পর্বতগুলিকে এমনভাবে খিল মেরে দিয়েছেন যে, ভূ-পৃষ্টের হিমালয় বরাবর বিপরীত দিকে মেক্সিকোতে সে মাথা খাড়া করে উঠে পড়েছে। যেন পৃথিবী দ্রুতগতিতে চলতে গেলে তার কোনো স্থানচ্যুতি না ঘটে। ৪. পৃথিবীকে এমনভাবে বিছিয়েছেন যে, মানুষ যেন তার গায়ের উপর বসবাস করতে পারে। অন্যদিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে সবকিছুকে পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

www.pathagar.com

١٢- اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ * ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ * لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ *

১২. তোমরা যে পানি পান করো তা নিয়ে কি কখনো চিন্তা-গবেষণা করে দেখেছো? মেঘ থেকে কি তোমরা পানি বর্ষাও, না আমি তা বর্ষাই? আমি ইচ্ছা করলে সমুদ্রের লোনা পানির ভিতর থেকে বাষ্পাকারে লোনা পানিই আনতে পারতাম, লোনা পানির মেঘ হতে লোনা পানি বর্ষাতে পারতাম। তোমাদের ক্ষতি হবে তাই তা করি না, তবু তো তোমরা শুকরিয়া আদায় করো না? (সূরা আল ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৬৮-৭০)

١٣- اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ *

১৩. কে তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষাণ আর তার দ্বারা সুন্দর সুন্দর বাগ-বাগিচা রচনা করেন-যার গাছপালাগুলো উদ্ভূত করা তোমাদের জন্য আদৌ সম্ভব ছিল না। আল্লাহর সঙ্গে এসব কাজে কি অন্য কেউ শরীক ছিল? বরং এসব লোক সত্যপথ থেকে ফিরে যাচ্ছে।

(সূরা আন-নামল ঃ ৬০)

١٤- اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ج

১৪. আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তার মধ্যে রয়েছে অন্ধকারময় মেঘমালা, ঝড়-তুফান, মেঘের ডাক ও বিদ্যুতের চমক (যার মাধ্যমে আকাশে রক্ষিত নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রেটে পরিণত হয় যা গাছের খাদ্য। আর তা পানির সঙ্গে মিশিয়ে আল্লাহ জমিনে বর্ষাণ যেন জমিন উর্বর হতে পারে)। (সূরা আল- বাকারা ঃ ১৯)

www.pathagar.com

١٥- وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا *

১৫. এবং আল্লাহ আকাশ থেকে (গাছের) আহারসহ যে পানি নাযিল করেন তার কল্যাণে অনুর্বর ভূমি উর্বর হয়ে ওঠে। (সূরা জাসিয়াহ ঃ ৫)

١٦- اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ *

১৬. কে তিনি যিনি দ্রুত চলমান পৃথিবীকে অনড় অবস্থায় রেখেছেন আর তার বুকচিরে বিশেষ নিয়মে নদী-নালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে খিল স্বরূপ পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন এবং পানির দু'টি ধারার মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর সঙ্গে এসব কাজে আর কেউ শরীক ছিল কি? বরং অধিকাংশ মানুষ এসব বোঝে না। (সূরা আন-নামল ঃ ৬১)

١٧- اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ *

১৭. কে তিনি যিনি স্থলপথে ও জলপথে পথ হারিয়ে গেলে তোমাদের পথ দেখান। আর কে তিনি যিনি বাতাসের সঙ্গে জলীয় বাষ্প পাঠান এবং সুসংবাদ পাঠান (বৃষ্টি হওয়ার)? এসব কাজ করার ব্যাপারে কেউ কি ছিল আল্লাহর সঙ্গে শরীক? তারা শির্ক করে যার সাথে আল্লাহ তার থেকে উর্ধ্বে। (সূরা আন-নামল ঃ ৬৩)

١٨- وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ *

১৮. এবং তিনি তাদেরকে তারকার সাহায্যে পথ দেখান (অর্থাৎ তারকার অংক করে বুঝতে পারবে যে সে কত ডিগ্রি অক্ষাংশে ও কত

www.pathagar.com

ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে আছে। আর তা জানতে পারলেই বুঝা যাবে কোনদিকে কত ডিগ্রি কোণ করে কত মাইল পথ অতিক্রম করলে আপন গন্তব্যস্থানে পৌঁছা যাবে)। (সূরা আন-নাহল ঃ ১৬)

١٩- قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ * (النمل *

১৯. (হে রাসূল! আপনি সেই অবিশ্বাসীদের) বলুন যে, উপরিউক্ত কাজগুলো করার ব্যাপারে যদি আর কেউ আল্লাহর সাথে শরীক থেকে থাকে তাহলে তার দলিল-প্রমাণ হাজির করো যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়।

(সূরা আন-নামল ঃ ৬৪)

٢- نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ *

২০. আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম, আর এর সত্যতা তোমরা স্বীকার করবে না কেন? (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ ঃ ৫৭)

٢١- فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ * وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ *

২১. যদি তোমরা আল্লাহর আওতার বাইরে হয়ে থাকো তাহলে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ যখন তার গলদেশ পর্যন্ত এসে যায় আর যখন তা স্বচক্ষে দেখো তখন তার প্রাণটা ফেরত নিয়ে আসতে পারো না কেন (অর্থাৎ মাত্র একটা মানুষেরই মৃত্যুটা একবার ঠেকাও দেখি কেমন পারো)?

(সূরা আল-ওয়াকিয়াহ্ ঃ ৮৩-৮৪)

শুধু এটাই নয়, বরং গোটা কুরআনই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যাই হচ্ছে এ ছোট্ট বইখানা। এ আয়াতগুলোর ব্যাখায় একই সঙ্গে ৫টি বিষয়ের প্রমাণ করবো। যথা ঃ

১. আল্লাহর অস্তিত্ব। ২. কুরআন আল্লাহর বাণী। ৩. হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। ৪. পরকাল হবেই যেখানে বিচার হবে ও বিচারের ফলভোগ করা লাগবেই এবং ৫. ইসলামই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য সঠিক ধর্ম।

www.pathagar.com

নাস্তিক্যবাদের উৎস

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাণীর আদি উৎপত্তি সম্পর্কে 'চার্লস ডারউইন' নামক একজন দার্শনিক (!) এক থিওরী পেশ করলেন যার নাম হলো 'ক্রমবিবর্তনবাদ'।

উক্ত থিওরীতে বলা হলো, এককোষা প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশবাদের ধারা মোতাবেক ব্যাঙ, বানর ও বন-মানুষের পর্যায় পার হয়ে আমরা 'মানুষ' হয়ে পড়েছি। এ মতবাদে মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে 'প্রথম মানুষ' বলে স্বীকার করা হয় না এবং 'সৃষ্টিকর্তা' হিসেবে আল্লাহকেও স্বীকার করা হয় না। এ মতবাদে 'জীবন'-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, কতিপয় বস্তুগত শক্তির কারণে জীবন আপনা থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি পর্যায়। যথা ঃ

১. Reproduction—প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন নতুন জীবন সৃষ্টি হওয়া।

২. Varlation—উৎপন্ন বস্তুতে কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া।

৩. Differential Survival—বংশ পরম্পরায় উন্নতি লাভ করে এই পার্থক্যের সম্পূর্ণতা অর্জন করা।

উক্ত থিওরী অনুযায়ী আমরা নাকি 'এককোষা প্রাণী' থেকে 'মানুষ' হয়ে পড়েছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই কি মানব জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা? পক্ষান্তরে মানব জীবন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِى رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا *

অর্থ ঃ তুমি বলো যে, জীবন আল্লাহর হুকুমে সৃষ্ট একটা শক্তিমাত্র। এ সম্পর্কে বুঝার মতো জ্ঞান তোমাদের খুব সামান্যই দান করা হয়েছে।

(সূরা বনি ইসরাইল ঃ ৮৫)

আল্লাহর ভাষায় এ জীবনের মধ্যে রয়েছে اَلسَّمْعُ (শ্রবণশক্তি)। اَلْبَصَرُ (দৃষ্টিশক্তি), اَلْفُؤَادُ (বিচারবোধসম্পন্ন মন), اَلنَّوْمُ (ঘুম)

www.pathagar.com

اَلرُّؤْيَا (স্বপ্ন) এবং বর্ণনাশক্তি ইত্যাদি। কিন্তু নাস্তিকরা এসব তত্ত্ব ও তথ্য বেমালুম উপেক্ষা করে বলে উঠলো ঃ

১. ধর্ম অন্ধযুগের কুসংস্কার। ২. মানুষ যন্ত্রবৎ। ৩. মানব আদম থেকে নয়, বরং আদমের ২ হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ।

এ ধরনের অনেক কথাই তারা বললো।

ডারউইনের ধারণায় সৃষ্ট ক্রমবিকাশবাদের থিওরীকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন নব্য বিজ্ঞানী আল্লাহকে অস্বীকার করে বসলো।

ঐ সময় জার্মান বিজ্ঞানী কান্ট বললেন–'আমাকে বস্তু যোগাড় করে দাও, বিশ্ব কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি তা দেখিয়ে দিবো।'

হিকেল বললেন–'পানি, রাসায়নিক দ্রব্য ও উপযুক্ত সময় পেলে আমি মানুষ তৈরি করে দিতে পারি।'

ভলটেয়ার বললেন–'আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেনি বরং মানুষই তাদের কল্পনায় আল্লাহকে সৃষ্টি করে নিয়েছে।'

নিটশে বললেন–'আল্লাহ এখন আর বেঁচে নেই।'

তাদের ধারণায় মানুষ 'যন্ত্রবৎ'। তাদের বক্তব্য, মানুষ যতদিন জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ ছিল ততদিন তারা অসহায় মনকে বুঝ দেয়ার জন্য অগত্যা এক কল্পিত স্রষ্টাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে তাই এখন আর কোনো কল্পিত স্রষ্টাকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ঐ সময় পর্যন্ত যাদের মগজে চিন্তাবিভ্রাট ঢুকেছিল অর্থাৎ আল্লাহর ভাষায় যারা জ্ঞানের সদ্ব্যবহার ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তারা বিজ্ঞানীদের ঐ মতবাদ মেনে নিলো। আধুনিক যুগে এখান থেকেই প্রথম শুরু হয় আল্লাহকে অস্বীকার করার মতো এক দুষ্ট মানসিকতা। এ মানসিকতা যাদের পেয়ে বসলো তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ মতবাদ ছাত্রদের মগজে ঢুকানোর চেষ্টায় লিপ্ত হলো। এ চেষ্টা চলে আমাদের দেশেও। ফলে আমাদের ছেলেরা আস্তিক অবস্থায় শিক্ষালয়ে প্রবেশ করে, পরে অনেকেই নাস্তিক হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।

www.pathagar.com

নাস্তিকদের যুক্তি

আল্লাহকে অস্বীকার করার জন্য নাস্তিকদের যুক্তিগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রধান তা নিম্নে দেয়া হলো। যথা ঃ

১. আল্লাহকে দেখা যায় না।

২. পঞ্চ ইন্দ্রিয়া দ্বারা তা অনুভব করা যায় না।

৩. যারাই সৃষ্টিকর্তা মানে তারাই সৃষ্টিকর্তার দেয়া ধর্ম মানে। তাদের দাবি হচ্ছে এই যে, ধর্মীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সব-ই আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া। আর তা-ই যদি হয় তবে ধর্মীয় আইন-কানুন বা ধর্মের কথা অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। কিন্তু দেখা যায় যেখানেই ধর্মের কথা সেখানেই তা অবৈজ্ঞানিক। এতে প্রমাণ হয় ধর্মই অবৈজ্ঞানিক, এসব ধর্ম মানুষের তৈরি।

৪. আল্লাহকে মানার কোনো প্রয়োজন নেই। যতদিন জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভবপর হয় নাই ততদিন মানুষ অসহায় মনকে বুঝ দেয়ার জন্য অগত্যা এক কল্পিত আল্লাহকে মেনে নিয়েছিল। এখন যেহেতু জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে তাই এখন আর কল্পিত আল্লাহকে মানার কোনো প্রয়োজন নেই।

এছাড়াও কিছু ছোট-খাট যুক্তি তাদের আছে, কিন্তু সেগুলো সব-ই হচ্ছে ঐ ৪টি প্রধান যুক্তিরই শাখা-প্রশাখা মাত্র। তাদের যুক্তিগুলোর জবাব নিম্নে দেয়া হলো।

বিবেকের জবাব

১. যারই অস্তিত্ব আছে তার সবগুলোই কি আমরা চোখে দেখে থাকি? এখন এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের চরম উন্নতির যুগে এটা কোনো যুক্তিই নয় যে, যা বিশ্বাস করি তার সবকিছুই চোখে দেখা লাগবে। প্রকৃতপক্ষে অনেক কিছুই আমরা দেখি না অথচ তা বিশ্বাস করি। যেমন–

১. বায়ু দেখি না, গায়ে অনুভব করে তা বিশ্বাস করি।

২. অক্সিজেন দেখি না, কিন্তু তার গুণাগুণ উপলব্ধি করে তা বিশ্বাস করি। যেমন কোনো ঘরের দরজা-জানালা সবকিছু বন্ধ করে দেয়ার পর সেই ঘরের মানুষ যেমন বুঝতে পারে যে, কিসের যেন অভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ

www.pathagar.com

হয়ে আসছে। আবার দরজা বা জানালা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন স্বস্তির ভাব অনুভব হচ্ছে এবং তা থেকেই বুঝতে পারি বায়ুর মধ্যে একটা অদেখা পদার্থ আছে–যা নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা গ্রহণ করি।

৩. আমরা প্রশ্বাসের সাথে যে বায়ুটা ছেড়ে দেই সেটা তো আমাদের নাকের খুবই নিকটে থাকে, কারণ তা তো ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে যার মধ্যে থাকে কার্বন-ডাই–অক্সাইড গ্যাস। ঐ গ্যাসটা একবার বেরিয়ে এসে পুনরায় নাকে প্রবেশ করে না কেন? এবং কি করে বাইরের তাজা অক্সিজেনসহ বিশুদ্ধ বায়ু নাকে গ্রহণ করি? কোন ব্যবস্থাপনার কারণে? এ বায়ুটা যে দেখা যায় না এরইবা পিছনে কোন কারণ রয়েছে? বায়ু পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে কিভাবে লেগে থাকে? বায়ু গরম হলে তার আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পায় কেন? বায়ু কি করে জলীয় বাষ্প ধারণ করে? কি করে পুনরায় বায়ু তা ছেড়ে দেয়? কি করে তার থেকে মেঘ হয়? কি করে মেঘের পানির কণাগুলো একত্রে মিলে একটা পানির ফোঁটা তৈরি হয়? কেন ঐ পানিটা উপর দিকে না গিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে? এ সবকিছুর মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা আমরা চোখে দেখি না কিন্তু তার কাজ দেখে থাকি। যেমন–

১. মাধ্যকর্ষণ শক্তি দেখি না, কিন্তু যেকোনো জিনিসের ভার দেখে বা উপর থেকে কোনো কিছুকে নিচে পড়ে যাওয়া দেখে মাধ্যকর্ষণ শক্তির কথা বিশ্বাস করি।

২. মেঘ ও শিশির পড়া বা কুয়াশা দেখে বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণক্ষমতায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বায়ুর সংকোচন ও সম্প্রসারণ -ক্ষমতাকে।

৩. বেতারে কথা শুনে ও টেলিভিশন দেখে ইথারকে বিশ্বাসী করি।

৪. চোখ দিয়ে না দেখেও কাজ দেখে বৈদ্যুতিক শক্তিকে বিশ্বাস করি।

৫. চোখের সাহায্যে দেখি তাই দৃষ্টিশক্তিকে না দেখেই বিশ্বাস করি।

৬. কান দিয়ে শুনি তাই শ্রবণশক্তিকে না দেখেই তা বিশ্বাস করি।

এভাবে হাজারো জিনিসের কাজ দেখে তার শক্তিকে বিশ্বাস করি। সুতরাং এসব বিশ্বাস যখন করতে পারি তখন কি শুধু আল্লাহকেই তাঁর কাজ দেখে বিশ্বাস করা যাবে না? তাঁকে কি দেখাই লাগবে? অথচ তাঁর গোটা সৃষ্টিটাই তাঁর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

সাক্ষ্য থেকে বিশ্বাস

আমরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করি তারা নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণের সাক্ষ্য থেকে বিশ্বাস করে থাকি। এ বিশ্বাস কি আমাদের জন্য অযৌক্তিক? যদি তাই হয়, তবে–

১. একজন হাকিম কি করে নিজে কাউকে খুন করতে না দেখেই সাক্ষীর কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে একটা মানুষকে ফাঁসি দিতে পারেন? আর এই সাক্ষ্যর উপরই বিচার নির্ভরশীল। এই সাক্ষ্য ছাড়া বিচার বিভাগই অচল। এখানে কি করে গোটা পৃথিবীর বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে একমাত্র সাক্ষীর উপর নির্ভর করে?

২. প্রতিটি মানুষেরর জন্মদাতা পিতা কে–এ কথা মায়ের সাক্ষ্যতে মানুষ কি করে বিশ্বাস করতে পারে?

৩. অন্যের সাক্ষ্য পেয়ে কি করে মানুষ পৃথিবীর ভৌগোলিক বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো চোখে না দেখেও বিশ্বাস করতে পারে?

৪. কোনো মিথ্যবাদী লোকও যদি পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ ঘুরে এসে এক এক জায়গার এক এক ধরনের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেয় তখন তার কথায় কি করে ঐসব স্থানের না দেখা জিনিসগুলোও আমরা বিশ্বাস করতে পারি?

উক্ত বিষয়গুলো যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে বিশ্বাস করতে পারি তাহলে–

১. নবী-রাসূলগণের সাক্ষ্য থেকে আল্লাহকে কি বিশ্বান করা যাবে না? এখানে নিরপেক্ষ বিবেক কি বলে? বিবেক বিশ্বাসই করতে বলে। এরপরও যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাহলে হয় সে তার বিবেকের সঙ্গে দারুণভাবে দুশমনী করে অথবা নিরপেক্ষ বিবেক তার মধ্যে অনুপস্থিত ধরে নিতে হবে।

২. যে বিষয়টা-ই ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে তারই কি অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করি? আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরের জ্ঞানকে কি আমরা অস্বীকার করি? তাই যদি করি তাহলে–

www.pathagar.com

ক) সূর্যকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটা দ্বারা অর্থাৎ চোখ দ্বারা দেখে বিশ্বাস করতে পারি, কারণ সেটা ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতার মধ্যে, কিন্তু সূর্য যে পৃথিবীর চাইতে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড় যা আমরা বিশ্বাস করি তা আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারি? এর দ্বারা কি প্রমাণ হলো না যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও জ্ঞানের একটা পৃথক অবস্থান আছে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা বহু জিনিস বিশ্বাস করি।

খ) আমরা যে বিশ্বাস করি চাঁদে বায়ু নেই, সেখানে যেতে হলে কৃত্রিম অক্সিজেন নিয়ে যেতে হবে–এটা আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছিল? এখানে কি প্রমাণ হলো না যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধি ছাড়াও আরও জ্ঞান আছে যে জ্ঞান নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম। সুতরাং কারো দেখা কথার উপর বিশ্বাস না করেই শুধু জ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কৃত্রিম অক্সিজেন পরিমিত পরিমাণ অ্যাপোলো–১১-এর নভোচারীরা নিয়ে গিয়েছিল এবং যারাই মহাশূন্যে পাড়ি জমায় তারা প্রত্যেকেই এভাবে অক্সিজেন সাথে নেয়।

গ) তাছাড়া এক বিশেষ ধরনের পোশাক দ্বারা শরীরটাকে এমনভাবে জড়িয়ে নিতে হবে যেন বায়ুর আওতার বাইরে গেলে যেখানে বায়ুর সাধারণ চাপ থাকবে না তখন যেন কৃত্রিম চাপে তার দেহটা চাপযুক্ত থাকতে পারে। এমন পোশাকের প্রয়োজনীয়তা যে রয়েছে তা কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়েছিল? ইন্দ্রিয়ের বাইরেও যে মানুষের জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানে ধরা পড়েছিল। সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়া আল্লাহকে মানা যাবে না এটা কোনো যুক্তি নয়।

৩. তাদের ৩ নম্বর যুক্তি হচ্ছে বহু ধর্মীয় কথাবার্তা অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

হ্যাঁ, তা হতে পারে, তবে সব ধর্মের বেলায় ঠিক নয়। যেমন হিন্দু ধর্মে আছে, ইন্দ্রদেবতার তৈরি গরুর গাড়িতে করে সূর্যমামা পূর্বগগণ থেকে পশ্চিম গগণে গমন করে পশ্চিম সমুদ্রে ডুব দেয়, সেখান থেকে সুধা পান করে, তারপর তার উল্টো দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর দিক দিয়ে আবার ঐ গাড়িতে করে পূর্বগগণে গমন করে।

এটা অবশ্যই যুক্তিবিরোধী। কিন্তু শুধু এটাই কি সব ধর্মের কথা? এটা তো প্রাচীন যুগের কিছু মুনি-ঋষি-সাধু-তাপস–যাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে

www.pathagar.com

আদৌ সম্পর্ক ছিল না–তাদের কিছু কথা। কিন্তু এটা তো কুরআনের কথা নয়।

ঠিক তদ্রূপ খ্রিস্টানদের ধর্মযাজকগণ একসময় প্রচার করেছে যে, কেউ একগালে এক চড় মারলে তাকে আরেকটি গাল এগিয়ে দাও আরেকটি চড় মারার জন্য। এ কথায় জালিমদেরকে সমর্থন করা হয় এবং মজলুমদেরকে আরও বেশি অত্যাচারিত হওয়ার নসীহত করা হয়।

সুতরাং এই ধরনের কথা যদি কোনো ধর্মের পক্ষ থেকে বলা হয় তাহলে বুঝতে হবে সে ধর্ম বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের তৈরি। এ কথার সঙ্গে আমিও একমত।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, এটা কি আল্লাহর কথা, না রাসূলের কথা? এসব তো সুবিধাবাদীদের কথা।

যাদের চোখে শুধু এই ধরনের কিছু ধরা পড়ে তাদের চোখে কি গোটা কুরআনের আর কিছুই ধরা পড়লো না?

প্রকৃতপক্ষে যারা গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে নবী-রাসূলগণকে মানতে পারেনি তারা যেসব মনগড়া ধর্ম জনগণকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করে নিয়েছে, তাদের কথা আল্লাহ বলেছেন–'তারা জনগণের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবেই লুটে খায় এবং লোকদেরকে দ্বীনের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।'

পীর-সুফী-দরবেশ সেজে এমন কিছু লোক ইহুদী, নাসারা ও মুসলমান সব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই রয়েছে। তাদের ধর্মবিরোধী কার্যকলাপটাই নাস্তিকদের চোখে ধরা পড়লো অথচ রাসূল (সা)-এর জীবনীর কিছুই তাদের চোখে ধরা পড়লো না।

ধর্মীয় কথাগুলো কি যুক্তিবিরোধী, না বিজ্ঞানবিরোধী তা পরবর্তী আলোচনা থেকে আসুন বুঝার চেষ্টা করি। তাদের পরবর্তী যুক্তির উপরে ৪১টি যুক্তি এতে দেয়া হলো।

অতঃপর যার যার নিজের স্বার্থেই চিন্তা করুন নিম্নের উপস্থাপিত যুক্তিগুলোর উপর। তাহলে আশা করা যায় আপনার মগজেও ধরা পড়বে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ। যা অকাট্য ও মহাসত্য।

www.pathagar.com

আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে কুরআনভিত্তিক যুক্তিসমূহ

১ নং যুক্তি

নাস্তিক বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী যেভাবে সৃষ্টি এবং আল্লাহর মতে পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি

বিজ্ঞানীদের ধারণা ঃ কোনো একসময় নাকি সূর্যের পাশ দিয়ে একটা শক্তিশালী নক্ষত্র খুব দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছিলো, তার আকর্ষণে সূর্যের দুর্বল অংশ খসে পড়ে। সেই অংশগুলোকে সূর্যের 'গ্রহ' বলা হয়। তারই একটা গ্রহ হচ্ছে আমাদের এই 'পৃথিবী'।

অন্যান্য গ্রহগুলোও পৃথিবীর মতো একদিন সূর্যের মধ্যে ছিল। সূর্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি বলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে এখনো সেই তাপ রয়েছে, যে তাপসহ পৃথিবী সূর্য থেকে খসে পড়েছিল। এই কারণেই পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যার থেকে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে। আর উপরিভাগ থেকে তাপ কমে গেছে যার কারণে পৃথিবীর উপরিভাগটা শীতল হয়ে পড়েছে। এরপর বহু আবর্তন-বিবর্তনের পর বর্তমান অবস্থায় এসেছে। এটাই হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

অন্যদিকে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর কথা হচ্ছে ঃ

إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ *

অর্থ ঃ আল্লাহ যখন যা সৃষ্টি করার ইরাদা করেন তখন শুধু বলেন 'হও' আর তক্ষুনি তা হওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৮২)

তাই প্রত্যেকটি জিনিস অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি যাকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার জন্য শুধু হুকুম করেছেন। বলেছেন, 'হও।' আর সঙ্গে সঙ্গে তা হওয়া শুরু হয়ে গেছে।

অর্থাৎ তা হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অনেকে فَيَكُوْنُ (ফাইয়াকুন)-এর অর্থ করেন যে, হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়। يَكُوْنُ -এর মধ্যে রয়েছে বর্তমান কাল ও ভবিষ্যত কাল। সুতরাং يَكُوْنُ -এর অর্থ হবে 'হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল' যা পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত হতে থাকবে। এ সম্পর্কে পরে আরো কিছু কথা বলা হয়েছে।

এবার দেখা যাক পৃথিবী সম্পর্কে এ দু'টি মতের কোনটি যুক্তিগ্রাহ্য। কতিপয় বিজ্ঞানীর মতে, পৃথিবীর সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল শুধুমাত্র সূর্যের পাশ দিয়ে একটা শক্তিশালী নক্ষত্রকে দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া। যদি আকস্মিকভাবে একদিন এই ঘটনাটা না ঘটতো অর্থাৎ সূর্যের পাশ দিয়ে যদি সেই নক্ষত্রটা দ্রুতবেগে ছুটে না যেতো তাহলে পৃথিবী সৃষ্টি হতো না এবং আমরাও সৃষ্টি হতে পারতাম না, এটাই কতিপয় বিজ্ঞানীদের বক্তব্য। এবার দেখা যাক এ বক্তব্য কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য।

আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সূর্যের কিছু দুর্বল অংশ খসে পড়বে এটা কোনো অসম্ভব কিছু তা আমি বলতে চাচ্ছি না। তবে বলতে চাচ্ছি এই যে, ৫/৬ শত কোটি বছর পূর্বে মাত্র একদিনই কি এইরূপ একটা ঘটনা ঘটলো? আমরা তো দেখি অ্যাক্সিডেন্ট যেসব ব্যাপারে ঘটে থাকে সেসব ব্যাপারে অ্যাক্সিডেন্ট একবার ঘটেই শেষ হয় না, বারংবার তা ঘটে।

এই যে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটলো এটা কি এমন কোনো পরিকল্পিত অ্যাক্সিডেন্ট ছিল যে একবারই মাত্র ঘটবে, যেন পৃথিবীসহ আরও কিছু গ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়? আর এরপরে শত শত কোটি বছর চলে যাবে আর কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে না, এমন কিছু ছিল কি? যদি এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা থেকে থাকে, তবে সেই পরিকল্পনাকারীকেই 'সৃষ্টিকর্তা' বলে স্বীকার না করার আর কোনো যুক্তি থাকে না।

আর যদি বলা হয় যে, এটা কোনো পরিকল্পিত অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না, তাহলে পুনরায় প্রশ্ন জাগবে যে, এমন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট কেউ কি কোনোদিন হতে দেখেছে বা পৃথিবীর ইতিহাসে এর কি কোনো নজির আছে যে, কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট মাত্র একবারই ঘটেছিল, পরে আর ঘটেনি। কিংবা জ্যোতির্বিদদের পরীক্ষায় এটা কি ধরা পড়েছে যে, সূর্যের মতো প্রতিটি নক্ষত্রই তো একটা করে সূর্য, তাদের সঙ্গে কি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে প্রতিটি নক্ষত্রেরই আমাদের সূর্যের মতো কয়েকটি করে গ্রহ সৃষ্টি হয়ে

www.pathagar.com

রয়েছে এবং সেখানেও কি ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী আমাদের মতো মানুষ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীদের চুপ থাকা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কিন্তু আল্লাহ এ সম্পর্কে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لا وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَا ط بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا *

অর্থ ঃ আল্লাহ তো তিনি যিনি সাতস্তর আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং তার অনুরূপ কিছু পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন, সেসব পৃথিবীতে তিনি অহী নাযিল করে থাকেন (এ কথা তোমাদেরকে এই জন্য বলা হলো) যেন তোমরা বুঝতে পারো যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান এবং (এ কথাও যেন তোমরা বুঝতে পারো যে) অবশ্য আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। (সূরা আত-তালাক ঃ ১২)

আল্লাহর এ কথা থেকে প্রমাণ হয় যে, মহাশূন্যের মধ্যে আল্লাহ হয়ত হাজার হাজার পৃথিবী সৃষ্টি করে রেখেছেন, আর তিনি তা রাখতে সম্পূর্ণ সক্ষম। হয়ত এমনও হতে পারে যে, প্রত্যেকটি নক্ষত্রই একটা সূর্য এবং তার প্রত্যেকটি নক্ষত্রেরই হয়ত আমাদের সূর্যের মতো কতকগুলো করে গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে। আর তা থাকলে তাদের প্রত্যেকেরই একটা করে আলোর জগৎ হয়ত আছে। এ নিয়ে আমার আসলে কোনো প্রশ্ন নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এইখানে যে, কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে যদি পৃথিবী সৃষ্টি হতো তাহলে পৃথিবী কি মানুষের বা প্রাণীর ব্যবহারযোগ্য হতে পারতো?

আসুন এবার আমরা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি কেমন হয় তা যাচাই করে দেখি।

এ পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, যাকিছুই দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয় তা কারো ব্যবহারযোগ্য হয় না। যেমন–দু'টি বাসে সামনাসামনি ধাক্কা লাগলে তার সামনের কাঁচটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে এমন এক খণ্ড কাঁচ পাওয়া যায় না, যা একটা লুকিং গ্লাস করার মতো

www.pathagar.com

গোল হয়ে বা চারকোণওয়ালা হয়ে ভেঙ্গেছে। এমনকি চশমার ফ্রেমে ফিট হওয়ার মতোও একখণ্ড কাঁচ তার মধ্যে পাওয়া যাবে না।

অনুরূপভাবে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট করে যদি তার লোহার পার্টসপত্র ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরা হয়ে যায় তবে তার মধ্যেও কি মানুষের ব্যবহারযোগ্য এক খণ্ড লোহা পাওয়া যাবে? যেমন একখানা দা, খুন্তি কিংবা একটা সুঁচ অথবা কমপক্ষে জুতায় মারা একটা কুলকাটা কি তার মধ্যে পাওয়া যাবে? তা অবশ্যই পাওয়া যাবে না। তাহলে এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অ্যাক্সিডেন্টের ফলে সৃষ্ট কোনো জিনিস ব্যবহারযোগ্য হয় না। আমরা দেখি যা-ই ব্যবহারযোগ্য তা-ই পরিকল্পিত সৃষ্টি।

এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবী অ্যাক্সিডেন্টের ফলে সৃষ্টি হলে তা নিশ্চয়ই মানুষের ব্যবহারযোগ্য হতে পারতো না এবং যেহেতু প্রত্যেকটি ব্যবহারযোগ্য জিনিসই পরিকল্পিত সৃষ্টি, আর পৃথিবীও যেহেতু ব্যবহারযোগ্য তাই পৃথিবীও পরিকল্পিত সৃষ্টি। এই পরিকল্পনাটা যাঁর, সৃষ্টিটাও তাঁরই এবং তিনিই হচ্ছেন 'আল্লাহ'।

তাই আল্লাহ বলেন– 'পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা আমার পরিকল্পিত সৃষ্টি।'

এসব বিষয় মানুষ চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের মন থেকে আপনা হতেই এ কথা বেরিয়ে আসবে যে, * رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! তোমার সৃষ্টির কোনো কিছুই অযথা সৃষ্টি করোনি। সব-ই মানুষের উপকারার্থে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছো।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯১)

এর পরবর্তী যুক্তিগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করতে পারবো যে, এ পৃথিবী কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি নয়, এ সব-ই দয়ালু আল্লাহর পরিকল্পিত সৃষ্টি।

পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ *

www.pathagar.com

অর্থ ঃ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। যা ছিল ধোঁয়াবিশেষ। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাকে (আকাশকে) এবং পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক (ধোঁয়ার ভিতর থেকে) আমার হুকুম অনুযায়ী বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত হও। উত্তরে তারা উভয়ে বললো, আমরা তো পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে প্রস্তুত আছিই।

(সূরা হা-মীম আস-সাজ্‌দাহ ঃ ১১)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পূর্বে এমন এক সময় ছিল যেদিন আসমান ও জমিন ছিল না। ছিল মাত্র ধোঁয়ার মতো কোনো বস্তু। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো আসমান ও জমিন, আর তার থেকে সৃষ্টি হলো কোটি কোটি নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ। সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে একই মূলবস্তু থেকে। সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের পরিবারবর্গ (সৌরজগৎ) সূর্য থেকেই। কিন্তু মানতে হবে যে, এ সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে এক পরিকল্পিত পন্থায়। এছাড়াও সূরা ইয়াসীনের মধ্যে যেখানে বলা হয়েছে كُنْ فَيَكُوْنُ (কুন ফাইয়াকুন) অর্থাৎ আল্লাহ বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

এখানে فَيَكُوْنُ -এর সঠিক অর্থ এ নয় যে, হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। يَكُوْنُ শব্দের মধ্যে দু'টি কাল, যথা ঃ

১. বর্তমান কাল এবং ২. ভবিষ্যৎ কাল। আর এ দুই কাল একসঙ্গে মিলে হয় আরেকটি কাল আর তা হচ্ছে Future Continuous Tense আর তার অর্থটা দাঁড়ায় 'হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং হতে থাকে।' যেমন, আল্লাহর হুকুম হয় ডিমের মধ্যে একটা 'বাচ্চা পয়দা হও,' এই হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমের মধ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা তৈরি হয়ে পড়ে না, বাচ্চা তৈরি হওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায়। অতঃপর একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেই একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা ডিমের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে।

ঠিক তেমনি আল্লাহ হুকুম করলেন–'পৃথিবী তৈরি হও,' তখন চোখের পলকের মধ্যেই এমন একটি পৃথিবী তৈরি হয়নি–যেখানে মাঝে মাঝে দালান-কোঠাওয়ালা শহর ছিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ছিল, কোটি কোটি মানুষ বসবাস করতেছিল– يَكُوْنُ -এর অর্থ তা নয়। এর অর্থ হলো আল্লাহর كُنْ (কুন) হুকুম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। পরে একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পর একটা পূর্ণাঙ্গ পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে পড়লো। এসব কথার সঙ্গে বিজ্ঞানের চিন্তা-ভাবনার যদিও মিল আছে তবু এ কথা মানতেই হবে যে, এটা আল্লাহর পরিকল্পিত সৃষ্টি। এটা হঠাৎ করে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হওয়া কোনো কিছু নয়। কিংবা এমনও নয় যে, এর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই।

২ নং যুক্তি

নাস্তিক বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মানুষ বনাম আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ

কতিপয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মানুষ যন্ত্রবৎ। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ বাকশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এবার দেখা যাক উপরিউক্ত দু'টি মতের কোনটি ঠিক। আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ *

অর্থ ঃ বলুন! তিনি (আল্লাহ) তোমাদের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোতে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তা-ভাবনা করার মন দিয়েছেন (ফল মানুষের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে), কিন্তু তোমরা খুব কমই আছো যারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। (সূরা আল-মুলক ঃ ২৩)

ব্যাখ্যা ঃ একটা মেশিনকে খুলে ফেললে যেমন অনেক ছোট ছোট পার্টসপত্র বেরিয়ে আসে এবং সেগুলোকে পরস্পর সাজিয়ে যেমন একটা চলনসই মেশিন তৈরি করা হয় ঠিক তেমনি অসংখ্য ছোট ছোট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একসঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক পন্থায় সাজিয়ে একটা মানুষের দেহ গঠিত হয়। আর সেগুলো (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো) এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, ঠিক যেখানে যা হলে মানানসই হয় সেখানেই তা দিয়ে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ হাতের জায়গায় হাত, পায়ের জায়গায় পা,

www.pathagar.com

চোখের জায়গায় চোখ, কানের জায়গায় কান। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কত সুন্দরভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সাজানো হয়েছে–যার মধ্যে একচুল পরিমাণ কোনো অবিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা নেই। এই কথাটাকেই বুঝানো হয়েছে اَنْشَاَكُمْ কথা দ্বারা।

যদি মানুষের শুধু অঙ্গগুলোই মেশিনের মতো সাজানো-গুছানো থাকতো তবে মানুষকে যন্ত্রবৎ বলা যেত। কিন্তু মানুষ সম্পর্কে আরও কিছু কথা আল্লাহ বলেছেন, তা হচ্ছে পরবর্তী কথাগুলো। যথা ঃ শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও মন।

তাছাড়া অন্য এক জায়াগায় আল্লাহ্ বলেছেন ঃ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

অর্থাৎ 'এবং তিনি তাদেরকে (মানুষদের) বর্ণনাশক্তি দিয়েছেন।'

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ * وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (النبا

অর্থ ঃ আমি তোমাদের (মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য) ঘুম দিয়েছি।
(সূরা আন-নাবা ঃ ৯)

এছাড়াও মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ পাক আরও বহু কিছু বলেছেন।

এবার দেখা যাক বিজ্ঞানীদের কথা কতটুকু ধোপে টেকে।

আল্লাহ বলেছেন, মানুষকে শুধু যন্ত্রই করেননি, তাকে শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন। কোনো যন্ত্রই কি তেমনভাবে শুনতে-দেখতে পারে? আর পারবে কি মানুষের মতো চিন্তা-ভাবনা করতে? এবং পারবে কি কোনো যন্ত্র মানুষের মতো ঘুমাতে? আর ঘুমিয়ে ২/১টি স্বপ্ন দেখতে এবং ঘুম থেকে জেগে বলতে পারবে কি যে, আমি অমুক অমুক জিনিস স্বপ্নে দেখেছি। আর পারবে কি মানুষের মতো খানিকক্ষণ বক্তৃতা করতে এবং কারো সঙ্গে ভালোবাসা করতে? কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে কিছুক্ষণ কাঁদতে পারবে কি কোনো যন্ত্র?

এছাড়াও মানুষের মধ্যে যেমন স্ত্রী-পুরুষ আছে, যাদের সন্তান হয় এবং ছোট সন্তান ক্রমেক্রমে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে বর্ধিত হতে থাকে তেমনি কোনো বৃহৎ মেশিনের পেট থেকে একটা শিশু-মেশিন কি বের হয়ে আসবে এবং তা পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে মানব-সন্তানের মতো বড় হতে

www.pathagar.com

পারবে কি? তা যদি পারে তবে সেইদিনই মানুষের সঙ্গে সাধারণ যন্ত্রকে তুলনা করা চলবে, তার পূর্বে নয়।

তাছাড়া মানব-দেহের স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যকার যে পার্থক্য এবং সন্তান জন্মলাভের যে আল্লাহর বিধান রয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা কি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে দেয়া সম্ভব হবে? তা কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না।

৩ নং যুক্তি

মানুষের জন্মবৃত্তান্ত

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ *

অর্থ ঃ তোমরা কি বীর্যকীটের দিকে লক্ষ্য করে দেখেছো যা তোমরা (জরায়ুতে) নিক্ষেপ করো (যে আমি তা থেকে কি কৌশলে তোমাদের সৃষ্টি করি)? তোমরা কি তা থেকে নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারতে নাকি আমি তা করে থাকি? (নিশ্চয়ই আল্লাহই তা করেন।)

(সূরা আল-ওয়াকিয়াহ ঃ ৫৮-৫৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অন্য একটি আয়াত থেকে। যেমন সূরা মু'মিনুনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ * ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ *

অর্থ ঃ আমি মানুষকে মাটির সারবস্তু হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তা এক টপকানো ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি। পরে সেই ফোঁটাকে জমাটবাঁধা এক রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছি। তাকেই অস্থিমজ্জা বানিয়েছি, সে অস্থিমজ্জার উপর গোশত পরিয়েছি। শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত তাকে আবার সৃষ্টির রূপ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। অতএব খুবই বরকতসম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সমস্ত কারিগর হতে উত্তম কারিগর।

(সূরা মু'মিনূন ঃ ১২-১৪)

উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলো নিজে নিজেই হয়ে যেতে পারে কি? আর এভাবে কেউ নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে কি? আল্লাহ পাকের এসব কথার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে মানুষের মন আপনা হতেই বলে উঠবে ঃ * فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ অর্থাৎ 'অতএব খুবই বরকতসম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সমস্ত কারিগর হতে উত্তম কারিগর।'

বাস্তবতাবিরোধী যুক্তি

এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অংকের সূত্র ও উত্তর ঠিক হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল হয় না। ঠিক তেমনি অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের থিওরী ঠিক থাকলেও তা বাস্তবতাবিরোধী হয়ে পড়তে পারে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলবো, যদি এমন একটা অংক কষতে দেয়া যায় যে, ২০ জন মিস্ত্রি প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা কাজ করে যদি ৩০ দিনে একটা দালান তৈরি করতে পারে তবে ১,৮০,০০০ (একলক্ষ আশিহাজার) মিস্ত্রি একসঙ্গে কাজ করলে ঐ দালান তৈরি করতে কত সময় লাগবে? তাহলে এর সঠিক ও নির্ভুল উত্তর হবে ১ মিনিট। কিন্তু এক মিনিটে কি এটা দালান তৈরি করা সম্ভব হয়?

এখানে যেমন অংকের উত্তর ঠিক হলেও তা বাস্তবতাবিরোধী ঠিক তেমনি ডারউইনের থিওরী ঠিক হলেও তা বাস্তবতাবিরোধী। তা কখনো ঘটবার নয়। অর্থাৎ হিসেবে পাওয়া গেলেও মানুষকে কখনো 'যন্ত্রবৎ' বলা যাবে না, বানরও কোনোদিন মানুষ হবে না এবং ডক্টর শহীদুল্লাহর ভাষায় ভবিষ্যতের মানুষও কোনোদিন একটা বিরাট মাথায় পরিণত হবে না।

মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে সেই মাকেই যারা অস্বীকার করে তারাও যেমন বাস্তববিরোধী ঠিক তেমনি আল্লাহর মেহেরবানীতে জীবন লাভ করে সেই আল্লাহকেই যারা অস্বীকার করে তারাও তেমনি কাট্টা বাস্তববিরোধী। আল্লাহর ভাষায় ঃ نَسِىَ خَلْقَهٗ অর্থাৎ 'তারা ভুলে যায় তাদের জন্মের ব্যাপারটা।'

কিন্তু এখন কি আর এসব বাস্তববিরোধী যুক্তির যুগ আছে?

www.pathagar.com

৪ নং যুক্তি

দিন-রাত ও চাঁদ-সূর্য মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ *

অর্থ ঃ এবং রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্যকে আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং নক্ষত্রপুঞ্জ তার হুকুমের ফরমাবরদার হয়ে রয়েছে। এসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আন-নাহাল ঃ ১২)

আসুন, আল্লাহর এই কথার উপর চিন্তা-ভাবনা করে দেখি যে, এর মধ্যে বুঝার কি আছে।

আমরা চর্মচোখে দেখি সূর্য ২৪ ঘণ্টায়, চাঁদ ২৫ ঘণ্টায় ও তারকা ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে একবার পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে ঘুরে আসে অর্থাৎ পৃথিবীকে আবর্তন করে আসে।

আর বিজ্ঞানীরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখেন পৃথিবী সূর্যের চারপাশ দিয়ে প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। এর কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তা নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। আমার প্রশ্ন মহাশূন্যের মধ্যে যেখানে মানুষের তৈরি স্কাইল্যাব যা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছিল যার মধ্যে বিজ্ঞানীদের মতে নিখুঁত নির্ভুল হাজারও ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ফিট করা ছিল এবং তা (স্কাইল্যাবে) রাখা হয়েছিল পৃথিবী থেকে এক বিজ্ঞানসম্মত দূরত্বে। কিন্তু এত হাজারও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও তা টিকতে পারলো না, কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে ঢুকে পড়লো।

আর বিজ্ঞানীদের মতে এ পৃথিবীর সৃষ্টি নাকি ৫০০ শত কোটি বছর পূর্বে। ধরে নিলাম তা-ই ঠিক। তাই যদি হয়, আর এসব যদি অবৈজ্ঞানিক সৃষ্টি হতো তাহলে কি এই ৫০০ কোটি বছর মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহগুলো স্কাইল্যাবের মতো ধ্বংস হয়ে যেত না যদি এসবের

www.pathagar.com

কোনো ব্যবস্থাপক না থাকতো? আর স্কাইল্যাবের মতো চাঁদটা যদি পৃথিবীর উপর ধসে পড়তো তাহলে পৃথিবীর উপায়টা কি হতো?

সূর্যের চারপাশ দিয়ে বছরে একবার করে ঘুরে আসতে পৃথিবীকে যে পথ অতিক্রম করতে হয় তার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৬০ কোটি মাইল। অর্থাৎ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল+পৃথিবীর ব্যাসার্ধ=সমান প্রায় ১০ কোটি মাইল ×২×২২/৭= প্রায় ৬০ কোটি মাইল। পৃথিবী এই পথ ঘুরে আসে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায়। এতে পৃথিবীর বার্ষিক গতির গতিবেগ হয় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ মাইল। অর্থাৎ ৬০ কোটি মাইল÷৩৬৫×২৪ ঘণ্টা+৬ ঘণ্টা×৬০ মিনিট ×৬০ সেকেন্ড=১৯.০১ মাইল।

অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবী তার বার্ষিক গতির ফলে প্রতিনিয়ত প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ মাইল গতিবেগে ছুটছে। পৃথিবীর এই বার্ষিক গতির কথাই আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ * كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

অর্থ ঃ মহাশূন্যের সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে।
(সূরা লোকমান ঃ ২৯)

এই চলার পথে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার করে ঘোরে, যার ফলে দিন ও রাত হচ্ছে।

এই ঘোরার কথাই আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ *

অর্থ ঃ মহাশূন্যের মধ্যে সবকিছুই ঘুরছে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ *

অর্থ ঃ সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না এবং রাতও দিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০)

এর অর্থ মহাশূন্যের মধ্যে সবকিছুকেই এমন হিসাবমতো রাখা হয়েছে ও তাদের চলার পথ এমন বিজ্ঞোচিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যেন এর মধ্যে কোনোই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে না পারে।

www.pathagar.com

উক্ত কথাটাই বুঝানোর জন্য আল্লাহ বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ *

অর্থ ঃ এই কক্ষপথ ও গতি নির্ধারণ মহাশক্তিধরের বিজ্ঞোচিত নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮)

যার কারণে মহাশূন্যের কোনো কিছুই স্কাইল্যাবের মতো কক্ষচ্যুত হচ্ছে না ও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না।

আমরা চিন্তা করলে আরো দেখতে পাই, যদি মহাশূন্যের সবকিছুর চলার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষপথ না থাকতো তবে পৃথিবী প্রতিবছর সূর্যের চার পাশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে যদি (প্রতিবছর) এক চুল পরিমাণ করে সূর্যের দিকে এগোতে থাকতো (যেমন গ্রামোফোনের রেকর্ডের পাশে লাগিয়ে দেয়া পিনটা রেকর্ড ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে এক একবারের ঘোরায় এক এক চুল পরিমাণ করে রেকর্ডের কেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকে), তাহলে বহু পূর্বেই পৃথিবী বরফে ঢাকা পড়ে যেত।

অথবা বিপরীত দিকে এমনটি যদি হতে থাকতো তবে প্রতিবছর পৃথিবী ক্রমেক্রমে দূরে সরে গেলে তার চলার পথ বাড়তো, ফলে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় এক শীতকাল থেকে পরবর্তী শীতকাল আসতো না কিংবা যদি সূর্যের দিকে অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকতো তবে শুক্র গ্রহের মতো ৩৬৫ দিনের বহু পূর্বেই এক বছর পূর্ণ হয়ে যেত।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বছরপূর্তি সময়ের মধ্যে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কোনো কম-বেশি হচ্ছে না। আর হবেও না কোনোদিন।

চিন্তা করুন, যদি এর পিছনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা কার্যকর না থাকতো তবে এমন নির্ভুল পন্থায় কি দিন ও রাত, বছরপূর্তি ও ঋতুর পরিবর্তন হতে পারতো?

কস্মিনকালেও তা পারতো না।

www.pathagar.com

৫ নং যুক্তি

দিন ও রাত এবং ঋতুর পরিবর্তন

আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ *

অর্থ ঃ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০)

এ আয়াতে আল্লাহ বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে বলছেন, তোমরা চিন্তা করলে অবশ্যই বুঝবে যে, দিন ও রাত হওয়ার মধ্যে আল্লাহর কি কৌশল রয়েছে। প্রথমতঃ আমরা দেখি পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশের প্রায় ৬২ কোটি মাইল বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করার জন্য পৃথিবীর গতি করে দিয়েছেন প্রতিসেকেন্ডে প্রায় ২০ মাইল (প্রায় বলা হলো এজন্য যে, এই ২০ মাইল সংখ্যাটা হচ্ছে কাছাকাছি সংখ্যা নির্ভুল সংখ্যা ২০ মাইল থেকে সামান্য কিছু কম)। এতে পৃথিবীর চলার গতির কাছাকাছি সংখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপ (অবশ্য এ সংখ্যা পাওয়ার উপায় কি তা ইতিপূর্বে ৪ নং যুক্তির মধ্যে দেখানো হয়েছে) ঃ

প্রতি ১ সেকেন্ডে চলে ২০ মাইল।

প্রতি ১ মিনিটে চলে ২০×৬ = প্রায় ১,২০০ মাইল।

প্রতি ১ ঘণ্টায় চলে ১২০০×৬০ প্রায় ৭২,০০০ মাইল।

প্রতি ১ দিনে চলে ৭২০০০×২৪ = প্রায় ১৭,২৮,০০০ মাইল।

প্রতি ১ মাসে চলে ১৭,২৮,০০০×৩০= প্রায় ৫,১৮,৪০,০০০ মাইল।

প্রতি ১ বছরে চলে ৫,১৮,৪০,০০০×১২= প্রায় ৬২ কোটি মাইল।

পৃথিবী এভাবে যে চলছে এবং চলা অবস্থায়ই আছে এতে এক সেকেন্ডেরও কম-বেশি হচ্ছে না–এর পিছনে কি কোনো পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেই? কোনো পাগলেও কি বলবে যে তা নেই?

www.pathagar.com

এছাড়াও লক্ষণীয় যে, কোনো জিনিসকে যদি কোনো নির্দিষ্ট দিকে চলার জন্য গতি সৃষ্টি করে দেয়া যায় এবং তাকে যদি মাধ্যকর্ষণ শক্তি ও বায়ু বাধা না দেয় তবে সে একই গতিতে একই দিকে দিক পরিবর্তন না করে চলতে পারে। আমরা দেখে থাকি একটা বলকে যখন লাথি মেরে একটা গতি সৃষ্টি করে উপরে তুলে দেয়া হয় তখন বায়ু তাকে বাধা দেয় বলে তার গতি ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। আর মাধ্যকর্ষণ শক্তি নিচ থেকে আকর্ষণ করে বলে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। যদি বায়ু বাধা না দিতো এবং মাধ্যকর্ষণ শক্তি নিচের দিকে না টানতো তাহলে ঐ বল একটা নির্দিষ্ট গতিতে নির্দিষ্ট দিকে দিক পরিবর্তন ছাড়াই চলতে থাকতো।

ঠিক তদ্রূপ পৃথিবীর গতি না হয় ধরেই নেই যে, কোনো এক সময় কোনো এক কারণে নির্দিষ্ট গতিতে গতিশীল হয়েই পড়েছে, কিন্তু এই গতির বিনা নিয়ন্ত্রণে দিক পরিবর্তন হয় কি করে? যেমন সূর্যের চারপাশের পথ তো অবশ্যই বৃত্তাকার হতে হবে। নইলে একস্থান থেকে চলা শুরু করলে সেইস্থানে আর কোনোদিনও ফিরে আসতে পারবে না। সে যতই চলবে ততই তার রওয়ানা হওয়ার স্থান থেকে দূরত্ব বাড়বে, আর পথ যদি বৃত্তাকার হয় তাহলে অর্ধেক পথ চলার পর রওয়ানা হওয়ার স্থান ক্রমেই নিকটবর্তী হবে এবং পুরা পথ চলার পর সে তার পূর্বের স্থানে ফিরে আসবে। কিন্তু কোনো গতিশীল জিনিস বিনা নিয়ন্ত্রণে কি গোলাকার পথ ধরে চলতে পারে? তবে হ্যাঁ, কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, সূর্যের আকর্ষণে তার চারপাশ দিয়ে পৃথিবী ঘুরছে এবং এটা সম্ভব। কিন্তু এখানেও আমার প্রশ্ন আছে।

প্রশ্ন, সূর্যের আকর্ষণেই পৃথিবী তার চারপাশ দিয়ে যদি ঘোরে তাহলে ঘুরতে পারে, কিন্তু পৃথিবী থেকে সুর্যের দূরত্ব কখনো কম হয়, কখনো বেশি হয়–এটা কি করে হয়? যেমন পৌষ মাসের তুলনায় আষাঢ় মাসে পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ মাইল বেশি হয়। আর যখন পৌষ মাস থেকে দূরত্ব বেশি হওয়া শুরু হলো সেটা আবার হঠাৎ করে কমা আরম্ভ হয় কি করে? আর কমতে কমতে পৌষ মাস আসলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমার পর আবার এ দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণটা কি করে ঘটে?

www.pathagar.com

এভাবে যদি নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে প্রতি বছর এক চুল পরিমাণ করে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকতো তাহলে যতদিন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ততদিনে তো পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব এত বেশি বাড়তো যে, সূর্যকে এতদিনে একটা নক্ষত্রের মতো দেখা যেত কিংবা যদি প্রতিবছর এক চুল পরিমাণ করে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কমতে থাকতো তাহলে পৃথিবী কবে সূর্যের ভিতরে ঢুকে পড়তো।

কিন্তু কেন এমন হয়নি? আর এই যে আবহমানকাল থেকে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যে মাসে যে পরিমাণ কম-বেশি হয় তা সহকারেই দূরত্ব একই রকম রয়েছে এবং দিন ও রাত ছোট-বড় হলেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই এবং নেই বছরপূর্তিতে কোনো কম-বেশি।

এরপর পুনরায় প্রশ্ন, পৃথিবীর এক মেরু সূর্যের দিকে কিছুটা হেলে চলতে চলতে আবার কি করে হঠাৎ অন্যদিকে হেলা শুরু করে দেয় যেমন জুন মাসে পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্যের দিকে বেশ খানিকটা হেলে রইলো, তাই জুন মাসে উত্তর মেরু সূর্যের আলো পেলো। পেলো তো এমন পাওয়াই পেলো যে, সূর্য আর ডুবলোই না। এভাবে জুন মাসের আগে ও পরে মিলিয়ে একটানা সূর্যের কিরণ পেলো ৬ মাস। আর এ সময় দক্ষিণ মেরু রইলো সূর্যের কিরণ ছাড়া অবস্থায়, যদিও পুরা অন্ধকারে রইলো না।

আবার হঠাৎ কি করে দক্ষিণ মেরুর দিকটা সূর্যের দিকে হেলা শুরু হয়ে গেল। যে কারণে সেপ্টেম্বর থেকে দক্ষিণ মেরুতে সূর্য ওঠা শুরু হয়ে যায়। আর ডিসেম্বরে ভরদুপুরের মতো দক্ষিণ মেরুতে সূর্য একটানা কিরণ দিতে থাকে, আর এই সময় উত্তর মেরু হারিয়ে ফেলে সূর্যকে। এই যে নিয়মিত সময়ের কোনো হেরফের ছাড়াই একবার সূর্য বিষুবরেখার উত্তরে আর একবার সূর্য বিষুবরেখার দক্ষিণে চলে যায়, যার কারণে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন মৌসুমী ফল-ফলাদি আমরা পাচ্ছি, এটা কি কোনো ব্যবস্থাপক ছাড়াই সম্ভব? কোনো বদ্ধপাগলও বলবে না যে, এটা সম্ভব।

এসব কিছু চিন্তা-ভাবনা করলে জ্ঞানী লোকদের মাথায় অবশ্যই ধরা পড়বে যে কত সুনিপুণ তাঁর সৃষ্টিকৌশল। এ কারণেই উপরিউক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ ও জমিনের সৃষ্টিকৌশল এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন।

www.pathagar.com

সূরা ওয়াকিয়ার মধ্যে আল্লাহ পূর্বের কথার জবাবে এক জায়গায় বলেছেন ঃ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ *

অর্থ ঃ তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয় বরং আমি তারকার অবস্থিতি স্থানের কসম করে বলছি (যদি তোমরা এসব বিষয়ের ওপর চিন্তা-ভাবনা করো তাহলে) অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টিকৌশলের কিছু তোমরা অনুমান করতে পারবে।

অর্থাৎ চিন্তা করতে বলছেন এক তারকা থেকে অন্য তারকার দূরত্ব কত বেশি এবং তা কত বিজ্ঞানসম্মত দূরত্বে অবস্থিত।

দুই মাশরিক ও দুই মাগরিব

সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ *

অর্থ ঃ তিনি দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব।

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'মাশরিক' ও 'মাগরিব' থেকে দুটো করে অর্থ হয়, যথা ঃ 'মাশরিক' অর্থ সূর্য ওঠার স্থান ও সূর্য ওঠার সময় এবং 'মাগরিব' অর্থ সূর্য ডোবার স্থান ও সূর্য ডোবার সময়। এ কারণেই মাশরিক থেকে পূর্ব দিক ও একটা নির্দিষ্ট সময় বুঝি, ঠিক তেমনি মাগরিব থেকে পশ্চিম দিক ও মাগরিবের সময় বুঝে থাকি। এখানে আরবী ভাষায় দ্বিবচনের শব্দ গঠনপদ্ধতি অনুযায়ী 'মাশরিকাইন' ও 'মাগরিবাইন' বলে দ্বিবচনের অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এর অর্থ হবে সূর্য ওঠার দুই নিয়ম এবং সূর্য ডোবার দুই নিয়ম। এই দুই নিয়মের অর্থ হলো সূর্য বিষুবরেখার উত্তর থেকে কিছু দিন ওঠে এবং দক্ষিণ থেকে কিছুদিন ওঠে। সম্ভবতঃ এটাই হচ্ছে সূর্য ওঠার 'দুই নিয়ম'। আর সূর্য ডোবার 'দুই নিয়ম'-এর অর্থ হলো বিষুবরেখার উত্তর দিক দিয়ে কিছুদিন ডোবা এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে কিছুদিন ডোবা। এর ফলে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর এক বিশেষ দান। তাই আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন এই ভাষায় যে,

www.pathagar.com

'ফাবি আইয়ি আলা-ই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান?' অর্থাৎ 'সূর্যকে দুই নিয়মে ওঠানো ও ডোবানোর মধ্যে যে আমার মেহেরবানী রয়েছে তা কি তোমরা মিথ্যা মনে করতে পারো?'

এখন প্রশ্ন, সূর্যকে দুই নিয়মে ওঠানো ও ডোবানোর মধ্যে কি মেহেরবানী রয়েছে? এর মধ্যে এই মেহেরবানী রয়েছে যে, এতে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে, আর তাতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন মৌসুমী ফল গোটা পৃথিবীর মানুষ পেতে পারে। এটা কি কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ফল বা আকস্মিক ব্যাপার হতে পারে? কোনো বদ্ধপাগলও তা বলবে না।

এ ঋতু পরিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহর এক বিশেষ ব্যবস্থাপনা। তা হচ্ছে পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলই সূর্যের কিরণ লাভ করতে পারে। আর এর ফলে একই সময় হয় দুই বিপরীত গোলার্ধে বিপরীত ঋতু হয়ে থাকে। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে বাংলাদেশে যখন শীতকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধ অস্ট্রেলিয়ায় গরমকাল। আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো আল্লাহর সৃষ্টির সর্বত্র রয়েছে তাঁর মেহেরবানীর ও তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন।

৬ নং যুক্তি
গ্রহগুলোর কক্ষপথের অবস্থা

আকাশের মহাশূন্যে অবস্থিত গতিশীল পৃথিবী ও গতিশীল গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا *

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে যার যার কক্ষে[২] এমনভাবে ধরে রাখেন যেন কেউই আপন কক্ষপথ থেকে সরে নড়ে যেতে না পারে।
(সূরা ফাতির ঃ ৪১)

রেলগাড়ির চলার পথে যেমন পাটি বসানো থাকে, যে পাটি রেলগাড়ির চলাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ ট্রেন যত দ্রুতই চলুক না কেন, ট্রেনের লাইন চাকাকে সর্বদাই এমনভাবে ধরে রাখে যেন ট্রেন লাইনচ্যুত না হতে পারে

টীকা-২ ঃ রাসূল (সা) তাঁর এক বর্ণনায় أَنْ تَزُوْلَا শব্দের শেষে مِنْ مَكَانِهَا শব্দটা অতিরিক্ত জুড়ে দিয়েছেন যার অর্থ হলো 'নিজ নিজ কক্ষপথ থেকে'।

www.pathagar.com

এবং ট্রেনের লাইনটাও এমন মজবুত করে বসানো থাকে যেন লাইনটা সরে নড়ে যেতে না পারে।

ঠিক তেমনি মহাশূন্যের মধ্যে বসানো আল্লাহর লাইন যা মহাশূন্যের মধ্যে প্রতিটি নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন। সেই নির্ধারিত পথ থেকে চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী ও মহাকাশের যাবতীয় নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ দ্রুতগতিতে অনবরত ঘোরার সময় যেন লাইনচ্যুত না হয়ে যায় তাই বুঝানোর জন্য আল্লাহ উপরিউক্ত কথা বলেছেন। অর্থাৎ চর্মচক্ষে বায়ু যেমন দেখা যায় না ঠিক তেমনি মহাশূন্যের মধ্যে আল্লাহর বসানো কোটি কোটি রেললাইনের মতো লাইন বসানো রয়েছে যা আমরা চোখে দেখি না। এই কথাই আল্লাহ বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে ঃ * وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ

অর্থ ঃ শপথ সেই আকাশের, যে আকাশ অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথে ভরা। (সূরা আল-বুরুজ ঃ ১)

আমরা যেমন দেখি একটা বাসলাইনকে ক্রস করে একটা রেললাইন চলে গেছে ঠিক তেমনি মহাশূন্যের মধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথকে ক্রস করে অন্য গ্রহের কক্ষপথ অতিক্রম করেছে।

পৃথিবীর রেলক্রসিং-এ যেমন গেটম্যান ট্রেন চলার সময় বাসের পথকে বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনি ব্যবস্থা আল্লাহর মহাশূন্য রাজ্যেও রয়েছে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বছরের মধ্যে দুই সময় ৩০ লক্ষ মাইলের কম-বেশি হওয়ার কারণে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথকে ক্রস করেছে। কিন্তু আল্লাহ উভয় গ্রহের চলার সময় এমনভাবে ঠিক করে দিয়েছেন যে, কোনো গেটম্যান ছাড়াই যেন একটি গ্রহের সঙ্গে আরেকটি গ্রহের ও পৃথিবীর সঙ্গে তার নিকটতম গ্রহের সংঘর্ষ না হয়। এসব কথাই বুঝানো হয়েছে সূরা ইয়াসিনে ঃ

* ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

অর্থ ঃ আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নিদিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসিন ঃ ৩৮)

www.pathagar.com

৭ নং যুক্তি
রাত এবং দিনের বাড়া ও কমা

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا *

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন-রাতের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০)

দেখুন দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে দিন-রাত ছোট ও বড় হওয়ার ব্যবস্থা। আর এরই মাধ্যমে হয় ঋতুর পরিবর্তন, আর ঋতুর পরিবর্তনের কারণেই আমরা বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফল-ফলাদি পাই এবং পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষ সূর্যকিরণ পর্যায়ক্রমে সমানভাবে ভোগ করতে পারে। এরই মাধ্যমে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পৃথিবীর প্রতিটি এলাকার লোক তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো খাদ্যবস্তু পেতে পারে। এসব কি কোনো পরিকল্পনা ছাড়া হতে পারে?

৮ নং যুক্তি
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

শুধু তাই নয়, পৃথিবীর আরো অনেক বিষয়ের উপর আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا *

অর্থ ঃ তিনি আল্লাহ যিনি জমিনকে (পৃথিবীকে) বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তোমাদের পদানত করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা পৃথিবীর সকল জায়গার পথ দিয়ে চলাফেরা করতে পারো।

আল্লাহ যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীকে মানুষের পদানত করে দিয়েছেন তা হচ্ছে 'মাধ্যাকর্ষণ' শক্তি। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে পৃথিবীর যেখানেই আমরা যাই না কেন, মাটি সর্বক্ষণই আমাদের পায়ের নিচে থাকবে।

www.pathagar.com

আমরা যেদিককে 'উপরের দিক' বলি ঠিক সেদিকটাই আমেরিকায় 'নিচের দিক'। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থান থেকেই পৃথিবীর দিককেই 'নিচের দিক' মনে হয় ও পৃথিবীর বাহির পাশকেই 'উপরের দিক' মনে হয়।

এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে আমাদের পদানত করার কারণে আমরা যেমন জমিনের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারি তেমনি বৃষ্টির পানিটা মাটিতে এসে পড়তে পারে। গাছ থেকে ফলটা আকাশের দিকে না যেয়ে জমিনে এসে পড়ে। এমনকি পানির কলসটা কাত করলে পানিটা গ্লাসে এসে পড়ে এবং গ্লাসটা মুখে ধরে কাত করলে পানিটা মুখের মধ্যে যায় ঐ একই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে।

এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই মানুষগুলো পথ চলতে পারে, মানুষ পৃথিবীর গায়ের উপর অবস্থান করতে পারে, গাড়িগুলো চলতে পারে। ট্রেন তার লাইনের উপর টিকতে পারে, বৃষ্টির পানি নিচে এসে পড়তে পারে। এমনকি মানুষ যে কাপড় পরিধান করে এ কাপড়টাও শরীরকে ঢেকে রাখতো না যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকতো। কাপড় উল্টে গিয়ে মানুষ বেআব্রু হয়ে পড়তো।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে পকেটের টাকা-পয়সা, কাগজপত্র উপর দিয়ে বেরিয়ে চলে যেত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে কোনো জিনিসেরই ওজন থাকতো না। একটা বড় বিল্ডিং এক তোলা পরিমাণও ওজন হতো না। ফলে চোরে ইচ্ছা করলে যেকোনো জিনিসই হোক, বিনা বাধায় নিয়ে যেতে পারতো, তার মোটেই কষ্ট হতো না। ঢাকার বিল্ডিংগুলোকে এক রাতেই সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র একটা বড় শহর গড়ে নেয়া যেত এবং রাতারাতিই ঢাকা শহর ফাঁকা মাঠে পরিণত হয়ে পড়তো। এছাড়া পৃথিবীর কোনো শহরই একস্থানে বেশিদিন টিকতে পারতো না।

শুধু শহর নয় বরং কোনো কিছুই কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করতে পারতো না। মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুনরায় ঘরে ফিরে সে চিনতেই পারতো না যে তার ঘর কোনটা এবং তা কোথায় সরে গিয়ে কি অবস্থায় আছে। কোনো কিছুকেই কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে রাখা যেত না।

শুধু তাই নয়, গাছপালার মতো যারা শিকড় গেড়ে আছে তারা ছাড়া আর সবকিছুই পৃথিবীর গা ছেড়ে উপরে উঠে পড়তো এবং মহাশূন্যে

www.pathagar.com

হারিয়ে যেত, তা আর পাওয়া যেত না। এভাবে পৃথিবীর সবকিছুই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়তো।

সবচেয়ে বড় কথা হলো বৃষ্টির পানি কখনোই আর জমিনে এসে পড়তে পারতো না। ফলে জমিনে ফসল আবাদ হতে পারতো না এবং কোনো প্রাণীরই খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা হতে পারতো না।

শুধু তাই নয়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে বাতাসটাও পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে পারতো না। কারণ বাতাসেরও ওজন আছে, আর ওজন থাকার অর্থই হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে নিচের দিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ পৃথিবী তার গায়ের দিকে আকর্ষণ করে বাতাসকে নিজের সঙ্গে ধরে রাখার জন্য। এটা সাধারণের বুঝার সহজ উপায় হচ্ছে এই যে, কোনো জায়গায় ধোঁয়া দেখলে আমরা দেখতে পাই ধোঁয়া উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। এটা কেন হয়?

হয় এই জন্য যে, বাতাসের ওজনের চেয়ে ধোঁয়ার ওজন কম। এজন্যই হালকা ধোঁয়া ভারি বাতাসের ভিতর দিয়ে উপর উঠে যায়। যেমন পানি এবং কেরোসিন তেল–এই দুইটার মধ্যে পানির ওজন কেরোসিন তেলের ওজনের চেয়ে বেশি, তাই কেরোসিন তেলের মধ্যে পানি দিলে পানিটা নিচে নেমে যায় আর কেরোসিন তেল উপরে ভেসে উঠে। এটা দেখে যেমন বুঝতে পারি যে, সম-আয়তনের পানি অপেক্ষা কেরোসিন তেল হালকা ঠিক তেমনি ধোঁয়াকে উপরে উঠতে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, সম-আয়তনের বায়ু অপেক্ষা ধোঁয়া হালকা।

এর থেকে আরো প্রমাণ হলো যে, বায়ুরও ওজন আছে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বায়ুকে পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে ধরে রেখেছে। কিন্তু যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকতো তাহলে বায়ু পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে পারতো না এবং বায়ুর অবর্তমানে পৃথিবীর একটি প্রাণীও বাঁচতে পারতো না। এছাড়া যে কারণে মেঘ হয় এবং তা উপরে হয় সে কারণটাও আর থাকতো না, ফলে মেঘও হতে পারতো না। আর মেঘ হলেও বৃষ্টির পানি নিচে এসে পড়তে পারতো না এবং কেউ তা টেনে নিচে নামালেও যেখানে পড়তো সেখানেই পড়ে থাকতো, তা গড়াতে পারতো না। এমনকি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকলে 'উপর-নিচ'-ই থাকতো না। আর পা নিচের দিকে মাথা উপরে থাকার মতো কোনো ব্যবস্থাই থাকতো না।

www.pathagar.com

আল্লাহর এমন পরিকল্পিত ব্যবস্থা যে, সূর্যের কিরণে মাটি গরম হবে, আর মাটির গরম তাপ মাটির উপরিভাগকে সব সময় গরম করে রাখবে। আর বায়ুকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, বায়ু যত গরম হবে তত তার আয়তন বাড়বে। আর আয়তন বাড়লেই সে জলীয় বাষ্প ধারণক্ষমতা লাভ করবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করবে। এরপর আল্লাহর এমনই ব্যবস্থা যে, বায়ু যত উপরে উঠবে ততই ঠাণ্ডা হবে, আর ঠাণ্ডা হলেই তার আয়তন কম হয়ে যাবে। ফলে ঐ বায়ু আর পানিকে ধরে রাখতে পারবে না, পানির কণাগুলোকে ছেড়ে দিবে। তখন পানির ঐ ঘন কণাগুলোই মেঘে পরিণত হবে। এরপর বায়ু যতই ঠাণ্ডা হবে ততই আরো বেশি সংকুচিত হবে এবং পানির কণাগুলো ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী হয়ে অনেকগুলো কণা একত্রে মিশে একটা পানির ফোঁটা তৈরি হবে আর পানির ফোঁটাটাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি টেনে মাটিতে নামাবে। এভাবেই বৃষ্টিপাত হবে।

আল্লাহর এই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা যদি না থাকতো তাহলে কি এভাবে মেঘ হতে পারতো, আর মেঘের পানি কি মাটিতে এসে পৌছতে পারতো? এজন্যই তো আল্লাহ বলেছেন ঃ

ءَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ *

অর্থ ঃ তোমরা কি এভাবে মেঘ থেকে বৃষ্টি নামাও? নাকি আমি তা করে থাকি? (সূরা আল-ওয়াকিয়া ঃ ৬৯)

এসব দেখেও কি মনে হয় যে, এসব ব্যবস্থাপনা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে?

অতঃপর আল্লাহ বলেন–'এ পৃথিবীর কাজ যখন শেষ করবো, যখন কিয়ামত ঘটাবো তখন বর্তমানকার এ সিস্টেমই পাল্টে দেয়া হবে!'

যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও বায়ু তুলে নেয়া হবে তখন কিছুই আর ভারি থাকবে না। তখন سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

অর্থ ঃ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুপস্থিতিতে পাহাড় পর্বতের বন্ধনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে বালুর মতো উড়তে থাকবে। (সূরা আন-নাবা ঃ ২০)

www.pathagar.com

৯ নং যুক্তি

সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব সম্পর্কে

সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ বলেন ঃ * اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

অর্থ ঃ সূর্য ও চন্দ্রকে একটা নির্দিষ্ট হিসাবমতো রাখা হয়েছে।

ইতিপূর্বে আমরা সূর্য সম্পর্কে অনেক কিছুই আলোচনা করেছি। এবার চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব সম্পর্কে আল্লাহ কি বলছেন লক্ষ্য করুন।

আল্লাহ বলেছেন–'চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে যখন যতটুকু হলে পৃথিবীর মানুষ ও জীব-জানোয়ারের পক্ষে সুবিধা হবে আমি ঠিক ততটুকু দূরত্বে রেখে থাকি।'

দেখুন সূর্যের কিরণ এত বেশি পৃথিবীতে আসে না যাতে জীব-জন্তু ও গাছপালাগুলো পুড়ে মরে যায় এবং এত কমও আসে না যে, আমাদের ভিজা কাপড়গুলো না শুকায় ও আমরা বরফে ঢাকা পড়ে যাই। বরং আল্লাহ যথাযথই বলেছেন ঃ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط

অর্থ ঃ দয়ালু আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোনো ধরনের অবিজ্ঞোচিত সৃষ্টি কখনো দেখতে পাবে না। (সূরা আল-মুলক ঃ ৩)

সত্যিই আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকালে হতবাক হয়ে যেতে হয় যে, কি সুকৌশলে এ বিশ্বজাহানকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

দেখুন পৃথিবীর উত্তর অংশে যেহেতু স্থলভাগ বেশি তাই সূর্য যখন বিষুবরেখার উত্তরে জুন মাসের দিকে লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে ডিসেম্বর অপেক্ষা ৩০ লক্ষ মাইল বৃদ্ধি পায়। যেন তাপটা অত্যধিক তীব্র না হতে পারে এবং ডিসেম্বরে যেহেতু বেশির ভাগ পানির উপর সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে তখন উত্তরাংশের মূল ভাগের উপর যেহেতু বাঁকাভাবে অনেক পুরু বায়ুস্তর ভেদ করে সূর্যকিরণ আসে তাই সূর্যকে তখন আল্লাহ জুন মাসের তুলনায় ৩০ লক্ষ মাইল নিকটে এনে দেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের এই যে বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা এ কি কোনো মহাব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা ছাড়াই হতে পারে? তা কস্মিনকালেও হতে পারে না।

www.pathagar.com

চান্দ্রমাসের হাকীকত

এতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের কথা বলা হলো, এখন بِحُسْبَانٍ -এর মধ্যে চাঁদেরও যে একটা হিসাবের কথা আল্লাহ বলেছেন সেই চাঁদ সম্পর্কেও আসুন কিছু বুঝার চেষ্টা করি।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কম-বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কখনো কম-বেশি হয় না। চাঁদকে এমন এক হিসাবমতো দূরত্বে রাখা হয়েছে যে, তার থেকে এতটুকু পরিমাণ আকর্ষণ পৃথিবী পর্যন্ত আসতে পারে যেন নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হতে পারে। যদি চাঁদ আরো নিকটে হতো তাহলে জোয়ারে এত পানি বৃদ্ধি পেত যে, পৃথিবীর বুকে কোনো একটি প্রাণীও টিকতে পারতো না। আর যদি আরো দূরে থাকতো তাহলে জোয়ার-ভাটা হতোই না।

এছাড়াও আমরা চাঁদকে দেখি প্রতিদিন পূর্বের দিন থেকে কিছুটা দেরিতে ওঠে। এর ফলে চাঁদকে ক্রমেক্রমে বড় হতে দেখা যায়। আর পূর্ণিমার পরে চাঁদ ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে শেষ পর্যন্ত অমাবস্যা হয় এবং চাঁদের একটা মাস অতিবাহিত হয়।৩ এই মাসগুলো সৌরমাস অপেক্ষা একটু কম হয়, ফলে সৌরবছর থেকে চান্দ্রবছর প্রতিবছরে ১১ দিন করে কম হয়। যার ফলে আমরা প্রতি ৩৩ বছর অন্তর একবার বড় দিনে রমযান মাস পেয়ে থাকি।

১০ নং যুক্তি
সমুদ্রের পানিতে লবণের ভাণ্ডার

লবণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি কিছুটা জ্ঞান আছে। লবণ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। এই লবণের কথা আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا *

টীকা–৩ ঃ যদি চাঁদের বছর সৌরবছরের মতো হতো তাহলে যারা বড় দিনে রমযান পেতো তাদের সারাজীবন-ই বড় দিনে রোযা রাখতে হতো, আর যারা ছোট দিনে রমযান পেতো তারা সারাজীবনই ছোট দিনে রোযা রাখার সুযোগ পেতো। আর এমনটি হলে কারো প্রতি ইহসান এবং কারো প্রতি জুলুম করা হতো। এটা যেন না হয় সেজন্যই মহান আল্লাহ ইনসাফপূর্ণ এ ব্যবস্থা করেছেন। এটা কি বিনা পরিকল্পনায় হতে পারে?

www.pathagar.com

অর্থ ঃ যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে (সমুদ্রের ভিতর থেকে লোনা পানি বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে লোনা পানির মেঘ বানাতে পারতাম এবং বৃষ্টির) পানিকে লোনা করে দিতে পারতাম।

এখন চিন্তা করুন কেন আল্লাহ্ পাক সমুদ্রের পানির মধ্যে লবণকে সংরক্ষণ করলেন। এর বড় কারণ যেটা স্বাভাবিকভাবেই সবার নজরে ধরা পড়ে তাহলো এই লবণ পচন নিবারণ করে।

আমরা দেখি ইলিশ মাছে লবণ দিয়ে রাখলে তা আর পচে না। গরুর চামড়াগুলোকেও দেখি লবণ মেখে রাখার কারণে পচে না। এ কারণেই আল্লাহ পাক লবণের ভাণ্ডার করেছেন সমুদ্রের পানিতে। এজন্যই সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত যত মরা-পচা পানিতে ভেসে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে তা সবই সমুদ্রে সংরক্ষিত লবণে সংশোধিত হয়েছে এবং সমুদ্রের পানিকে সর্বক্ষণেই পচনমুক্ত অবস্থায় রেখেছে।

মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ যদি এভাবে সমুদ্রকে লবণের ভাণ্ডারে পরিণত না করতেন তাহলে সমুদ্রের পচা পানিতে একটিও সামুদ্রিক জীব বেঁচে থাকতে পারতো না এবং সমুদ্রের পচা পানির দুর্গন্ধে এবং বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থলভাগের কোনো জীবনই বাঁচতে পারতো না। এসব কিছু দেখেও কি মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করতে পারে না! যারা পারে না তাদের চরম দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা চলে!

১১ নং যুক্তি
বাতাসের মধ্যে গাছের খাদ্য

বাতাসের মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি টাকা মূল্যের গাছের খোরাক 'নাইট্রিক এসিড'। উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ج

অর্থ ঃ অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এমন যে, আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তেছে যার মধ্যে রয়েছে অন্ধকারময় (ঝড়-ঝটিকা) মেঘের তর্জন-গর্জন ও বিদ্যুতের চমক। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯)

আমরা সাধারণতঃ দেখি বৈশাখে বৃষ্টির সঙ্গে উপরিউক্ত জিনিসগুলো থাকেই। প্রশ্ন, তা কেন থাকে? এ থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, মাটি যখন

www.pathagar.com

শুকিয়ে যায় তখন মাটিতে যেমন পানি থাকে না তেমনি গাছের খাদ্যও পরিমিত পরিমাণ থাকে না। ফলে ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজন হয় যেমন পানির তেমনি প্রয়োজন হয় সারের। মহান আল্লাহ তাই ঝড়-তুফান, মেঘের ডাক ও বিজলীর চমকের মাধ্যমে পানির সঙ্গে গাছের খাদ্য নাইট্রোজেন গ্যাসকে নাইট্রেটে পরিণত করে তা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশিয়ে দেন–যার ফলে বৃষ্টির পানিতে জমি উর্বর হয়ে ওঠে। আর এজন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ * فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

অর্থ ঃ আর এভাবেই আমি মৃত বা অনুর্বর জমিনকে উর্বর করে গড়ে তুলি।

এ কারণেই বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে বলেছেন যে, যদি কয়েক বছর একাধিকক্রমে বিজলীর চমক ও বজ্রপাত বন্ধ থাকে তাহলে পৃথিবীর মাটি আর ফসল উৎপাদনের যোগ্য থাকবে না। তা হয়ে পড়বে ঝামা ইটের মতো যাতে কোনো গাছপালাই আর জন্মাতে পারবে না। এ অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্যই যে মেঘের তর্জন-গর্জন, বজ্রপাত এবং বিজলীর চমক তা এখন এই বিজ্ঞানের যুগে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

এখন বলুন, এ সবকিছুর কোনো ব্যাখ্যা কি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে দেয়া সম্ভব? আজ এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতির যুগেও যারা এর উপর চিন্তা-ভাবনা করে না এবং এতসব অকাট্য যুক্তি চোখের সামনে ভাসমান অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ আল্লাহকে চিনতে অক্ষম হয় তাহলে বলতে হবে সে চরম দুর্ভাগা কিংবা জ্ঞানপাপী। সূরা আর-রূমের ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়ও এ বিষয়ে একবার বলা হয়েছে।

১২ নং যুক্তি
আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাহিনী

সূয়া ইয়াসিনের ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ *

অর্থ ঃ তিনি যখন কোনো জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

www.pathagar.com

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবী আর এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যত কিছু আছে তা সবই ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে আরশের উপর আসীন হয়েছেন। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ৪)

যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদেরকে লক্ষ্য করে অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ * وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وٰبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ * ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ * فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَ حِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ *

অর্থ ঃ (হে নবী এদেরকে বলুন) তোমরা কি সেই আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করতেছো, অন্যদেরকে তার সমকক্ষ বানাচ্ছো–যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তো সমগ্র জগদ্বাসীর রব। আর তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) উপর হতে তার বুকে পাহাড়সমূহ দৃঢ়মূল করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে বরকতসমূহ সংস্থাপিত করেছেন। আর তাতে সব প্রার্থীর জন্য (অর্থাৎ যে যার সন্ধানী তার জন্য) প্রত্যেকের

www.pathagar.com

চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক পরিমাণমতো খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত করে রেখেছেন। এসব কাজ মোট ৪ দিনে সম্পন্ন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন। সেটা তখন শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন, অস্তিত্ব ধারণ করো, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। তখন তারা উভয়ই বললো, আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতোই। অতঃপর তিনি ২ দিনের মধ্যে সাত আসমান বানিয়ে দিলেন এবং তার প্রত্যেক আসমানে তার বিধি-বিধান অহী করা হলো। আর দুনিয়ার আসমানকে আমি প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং তা পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করলাম। এ সবকিছুই এক মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞ সত্তার পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৯-১২)

শব্দার্থ ঃ قُلْ – বলো। اَئِنَّكُمْ – তোমরা কি। لَتَكْفُرُوْنَ – তোমরা কুফরী করতেছো। بِالَّذِىْ – তার সাথে যিনি। خَلَقَ – সৃষ্টি করেছেন। الْاَرْضَ – পৃথিবীকে। فِىْ يَوْمَيْنِ – দুই দিনের মধ্যে। وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ – আর তোমরা বানাও তার সঙ্গে। اَنْدَادًا – প্রতিদ্বন্দ্বী। وَجَعَلَ فِيْهَا – ذٰلِكَ – এই তো। رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ – বিশ্বজাহানের প্রভু। – এবং সৃষ্টি করেছেন তাতে। رَوَاسِىَ – পর্বতসমূহ। مِنْ فَوْقِهَا – এর উপর থেকে। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপর আল্লাহ পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন। وَقَدَّرَفِيْهَا – এবং তাতে বরকতসমূহ সংস্থাপিত করেছেন। وٰبَرَكَ فِيْهَا – তাতে সবকিছুর ভাগ-বণ্টন ঠিক পরিমাণমতো করে দিয়েছেন। اَقْوَاتَهَا – এর রিযিকসমূহ। فِىْ – মধ্যে। اَرْبَعَةِ – চার। اَيَّامٍ – দিনে। (يَوْمٌ-এর বহুবচন) اَيَّام – বা দিনগুলোতে। سَوَاءً – সমান। لِّلسَّائِلِيْنَ – সব প্রার্থীদের জন্য। ثُمَّ – পুনরায়। اسْتَوٰى – লক্ষ্য আরোপ করলেন। اِلَى – দিকে। السَّمَاءِ – আকাশের। وَهِىَ – এবং

www.pathagar.com

তা (ছিল)। دُخَانٌ – ধোঁয়াবিশেষ। فَقَالَ – অতঃপর তিনি বললেন। لَهَا – তাকে (আসমানকে)। وَلِلْاَرْضِ – এবং জমিনকে। اِئْتِيَا – অস্তিত্ব ধারণ করো। طَوْعًا اَوْ كُرْهًا – ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। قَالَتَا – তারা বললো অর্থাৎ আকাশমণ্ডল ও জমিন বললো। اَتَيْنَا – আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম। طَائِعِيْنَ – অনুগতদের মতোই। فَقَضٰهُنَّ – অতঃপর এর সবকিছু সম্পন্ন করা হলো। سَبْعَ سَمٰوٰتٍ – সাত আসমান। فِىْ يَوْمَيْنِ – দুই দিনের মধ্যে। وَاَوْحٰى – এবং অহী করলেন। وَزَيَّنَا السَّمَآءَ – আকাশে এর হুকুম। فِى السَّمَاءِ اَمْرَهَا الدُّنْيَا – এবং সুসজ্জিত করলাম পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে। بِمَصَابِيْحَ – জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দ্বারা। وَحِفْظًا – এবং সংরক্ষণ। ذٰلِكَ – উহা। تَقْدِيْرُ – নির্ধারিত করা। الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ – মহাশক্তিধর ও মহাজ্ঞানী (কর্তৃক)।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা

উপরের আয়াতে (সূরা ইয়াসিনের ৮২ নং আয়াতেও) বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ কোনো জিনিস সৃষ্টির হুকুম করলে অমনি তা হয়ে যায়। তাই তিনি যেদিন পৃথিবী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন বললেন, 'কুন' বা 'হও', আর সঙ্গে সঙ্গে 'ফা-ইয়াকুন' তা হয়ে গেল। এর অর্থ এই নয় যে, মহাশূন্যের মধ্যে যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে 'কুন' বলার সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, জীব–জানোয়ার, ঘর-বাড়ি ও দলে দলে মানুষসহ এই পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়ে পড়লো।

দেখুন মুরগীর ডিমের মধ্যে যে বাচ্চাটা পয়দা হয় সে-ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া পয়দা হয় না। তার প্রতিও আল্লাহর 'কুন' শব্দের হুকুমের প্রয়োজন। আর আল্লাহ 'কুন' বললেই কি একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা তৈরি হয়ে

www.pathagar.com

তক্ষুনি ডিমের খোসা ভেঙ্গে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে? কই তা তো আসে না। তাহলে فَيَكُوْنُ -এর অর্থটা কি দাঁড়াবে?

আরবীতে একটা কালকে বলা হয় مُضَارِعٌ (মুজারে), যার মধ্যে থাকে দুইটা কাল অর্থাৎ বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল। يَكُوْنُ হচ্ছে সেই مُضَارِعٌ যার মধ্যে রয়েছে দুইটা কালের কথা, যথা ঃ বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল। তাহলে فَيَكُوْنُ -এর অর্থ দাঁড়ালো 'হচ্ছে' ও 'হবে' বা 'হতে থাকবে'। আর এই অর্থটা গ্রহণ করলেই সব ধাঁধার অবসান ঘটে যায়।

ডিমের মধ্যে মুরগীর বাচ্ছা যেমন আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে না ঠিক তেমনি হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বর্তমান যেমন আকারে রয়েছে, এইরূপ সৃষ্টি হয়নি। মুরগীর ডিমের মধ্যে যেমন একটা নির্দিষ্ট সময় পার না হলে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা সৃষ্টি হয় না, সেখানে যেমন আল্লাহরই তৈরি একটা বিধানের মাধ্যমে বাচ্ছাটা পূর্ণতা লাভ করে, ঠিক তেমনি পৃথিবীও একটা বিধানের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লাহ একস্থানে বলেছেন–'লান তাজিদা লি সুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা।' অর্থাৎ 'আল্লাহর আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে কোনো পরিবর্তন কখনোই পাবে না।' তাহলে এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সবকিছু আল্লাহর হুকুমে হয় এটাও যেমন ষোল আনা ঠিক তেমনি আল্লাহর তৈরি বিধানের বাইরে কিছু সৃষ্টি হয় না এটাও ষোল আনা ঠিক। আল্লাহ যখনই পৃথিবীকে সৃষ্টি হওয়ার হুকুম করলেন তখন থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তা সৃষ্টি হয় 'ফী সিত্তাতে আইয়্যামিন' অর্থাৎ ছয় দিনের মধ্যে।

এখানে ছয় দিন থেকে ২৪ ঘণ্টায় পর পর ছয় দিনেও বুঝা যেতে পারে কিংবা ছয় যুগও ধরা যেতে পারে। আমরা যখন বলি 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' তখন 'আইয়াম' অর্থ 'যুগ'। সুতরাং এখানে যদি 'আইয়াম' থেকে 'যুগ' এবং 'ইয়াকুনু' থেকে 'হওয়া'-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল ধরি তাহলে এ সম্পর্কীয় যাবতীয় ধাঁধার অবসান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ধরতে হবে তা-ই।

www.pathagar.com

কুরআন ও বিজ্ঞানে সবক্ষেত্রে টক্কর নেই

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান যেখানে 'ভুল' করেনি সেখানে কুরআন ও বিজ্ঞানে কোনো টক্কর নেই। আর যেখানেই বিজ্ঞান 'ভুল' করেছে সেখানেই কুরআনের সঙ্গে বিজ্ঞানের টক্কর লেগেছে। আমাদের সমাজে (অবশ্য আমার দৃষ্টিতে) ৩ ধরনের পোক্ত ঈমানদার লোক দেখা যায়। যথা ঃ

১. খুব ইখলাসের সঙ্গেই একশ্রেণীর লোক বিজ্ঞানের সাথে বিরোধিতা করেন। তাদের ইখলাসের মধ্যে কোনো ঘাটতি নেই, তবে চিন্তার মধ্যে জ্ঞানের অগোচরেই কিছুটা মুখলেসানা গোঁড়ামী আছে।

২. বিজ্ঞান 'ভুল' বললেও কুরআনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কুরআনের ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। তাদেরও ইখলাসের মধ্যে আমার চোখে কোনো ঘাটতি দেখি না। তবে প্রকারান্তরে তারা যে কুরআনের চাইতে বিজ্ঞানকেই বড় ধরে নেন তা তাদের জ্ঞানে ধরা পড়ে না।

৩. বিজ্ঞান যা বলে সেটা কুরআনের দৃষ্টিতে 'ঠিক' হলে তাকে 'ঠিক' বলেই মানে। আর কুরআনের দৃষ্টিতে 'বেঠিক' হলে তাকে 'বেঠিক' বলেই মানে। আমি আমার জ্ঞান অনুযায়ী এই ৩য় দলে আছি।

আমি এই শেষ দলভুক্ত থেকে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের কথা কুরআনবিরোধী নয়। আমরা যদি শুধু 'কুন-ফাইয়াকুন'কে সামনে রেখে এবং 'ফাইয়াকুন'-এর অর্থ ধরি যে 'তক্ষুনি হয়ে গেল' তাহলে বিজ্ঞান ও কুরআনের মধ্যে অবশ্যই 'গরমিল' মনে হবে। কিন্তু সূরা হা-মিম আস-সাজদার ৪র্থ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৩য় আয়াত, সূরা হুদের ৭ম আয়াত, আল-ফুরকানের ৫ম আয়াত ইত্যাদি আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের আবিষ্কার কুরআনের বক্তব্যের মোটেই খেলাফ নয়। তবে খেলাফ শুধু এখানে যে, বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ পৃথিবীর সৃষ্টির যাবতীয় পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থাপনাকে 'আপনাআপনি' সৃষ্টি হওয়ার কথা বলছেন, আর কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিচ্ছেন।

যারা সৃষ্টিকর্তাকে মানছে না তাদের উদাহরণ হচ্ছে এমন যে, কোনো ব্যক্তি একটা নৌকা তৈরির যাবতীয় বাস্তব ব্যবস্থাপনা স্বীকার করে, কিন্তু

www.pathagar.com

মিস্ত্রিকে স্বীকার করে না। তাদেরকে আমরা হিসাবের বাইরে ধরে যদি তাদের পৃথিবী সৃষ্টির চিন্তা-ভাবনাটাকে সামনে রেখে কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতক'টির সঙ্গে মিল করে দেখি তবে দেখবো যে, ওদের (বিজ্ঞানীদের) চিন্তার ধারাটি ঠিকই আছে।

পৃথিবী কি সূর্য থেকে সৃষ্ট

সূর্য ও পৃথিবী কি পৃথকভাবে সৃষ্টি, নাকি সূর্য থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি –এটা এমন এক প্রশ্ন যে, এ প্রশ্নের মূল তাৎপর্য বুঝতে ভুল করেই অনেকে মনে করেন 'সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি'–একথা মানলে আল্লাহকে 'অস্বীকার' করা হবে।

কিন্তু আসল ব্যাপার বুঝলে আল্লাহকে অস্বীকার করার কিছুই নেই এর মধ্যে। যেমন গাছ থেকে ফল, মা থেকে সন্তান, মুরগীর পেট থেকে ডিম এসব কথা মানলে যেমন আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় না, ঠিক তেমনি 'সূর্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি'–একথা মানলেও আল্লাহকে 'অস্বীকার' করা হয় না।

মা থেকে সন্তান, গাছ থেকে ফল–এসব যেমন আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধান ঠিক তেমনি আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধান হচ্ছে একই মূল বস্তু থেকে সবকিছুর সৃষ্টি। যেটাকে আল্লাহ বলেছেন وَهِيَ دُخَانٌ অর্থাৎ 'তা প্রথমে ধোঁয়ার মতো ছিল,' তার থেকেই সবকিছুই সৃষ্টি।

এবার একটা যুক্তি দিচ্ছি যার থেকে প্রমাণ হবে যে, সূর্য থেকেই পৃথিবী সৃষ্টি এবং পৃথিবী থেকেই চাঁদের সৃষ্টি (আমার এ যুক্তি বিজ্ঞানকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধানকে বুঝার ও বুঝানোর উদ্দেশ্যে)।

আল্লাহ বলেন–'লান তাজিদা লিসুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা' অর্থাৎ 'আল্লাহর কোনো বিধানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন পাবে না।' এই আয়াতের তাৎপর্য বুঝানোর জন্যই আমার এ যুক্তির অবতারণা করা মাত্র।

আল্লাহর অনেক বিধানের মধ্যে একটি বিধান হচ্ছে 'গতিজড়তা' অর্থাৎ গতিশীল কোনো কিছুর উপর যা থাকে তাতে ঐ গতি জড়িয়ে যায়। যেমন আপনি যখন ট্রেনে খুব দ্রুতগতিতে চলছেন তখন একটা

www.pathagar.com

ডাবের পানিটুকু পান করে তাকে জানালা দিয়ে ঠিক সোজা নিচের দিকে অনায়াসে ছেড়ে দিন, দেখবেন ডাবটা সোজা নিচের দিকে না গিয়ে ট্রেন যে গতিতে সামনে ছুটতেছিল সেই একই গতিতে ঐ ডাবের খোসাটা ট্রেনের গা ঘেঁষে দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগোতে এগোতে মাটিতে গিয়ে পড়ে সামনের দিকে ছিটকে চলে যাবে আরো খানিকটা সামনের দিকে। মনে হবে যেন সে (ডাব) ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গেই এগোতে চাচ্ছে। সে যেন মাটিতে পড়ে সেখানে থাকতে চাচ্ছে না, সে ট্রেনের মায়া কাটাতে পারছে না। এর কারণ কি?

এর কারণ হলো, ঐ ডাবটা যেহেতু ট্রেনের মধ্যে ছিল তাই ট্রেন যে গতিতে চলতেছিল সেই গতিটাই ঐ ডাবের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, ফলে সে ঐ গতিতে সামনের দিকে এগোচ্ছিল এবং নিচে নামতেছিল এবং ঐ ডাবের প্রতি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বল প্রয়োগ না হতো তবে ঐ একই দিকে ট্রেনের গতিতে ডাব সামনে ছুটতে থাকতো। এরই নাম হচ্ছে 'গতিজড়তা'। আর এরই কারণে ডাবটাকে অনায়াসে ছেড়ে দিলেও মাটিতে পড়ে সামনের দিকে ছিটকে যাবে।

একই কারণে বাসে চলতে চলতে যদি হঠাৎ বাস ব্রেক করে তবে বাসের প্রত্যেক যাত্রী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বাস যে গতিতে চলতেছিল ঠিক সেই গতিটাই জড়িয়ে গিয়েছিল বাসে সব যাত্রীর গায়ে। ফলে বাসকে ব্রেক করার কারণে বাসকে আসলে পিছন থেকে ট্রেনে ধরা হয়, কিন্তু যাত্রীদের দেহ যেহেতু বাসের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়া থাকে না এবং তাদেরকে পিছন থেকে কেউ টেনে ধরে না, ফলে তার গায়ে যে গতিটা জড়িয়ে যায় সেই গতিতে সে সামনে চলতে থাকে। কিন্তু নিচ থেকে বাসকে ব্রেকের মাধ্যমে টেনে ধরা হয় ফলে বাসের সবকিছুই সামনে ঝুঁকে পড়ে। এটা সামনে ঝুঁকে পড়া নয়, এটা হচ্ছে একই গতিতে চলতে থাকা।

ঠিক এই একই কারণে দ্রুতগামী সাইকেলের সামনের চাকায় ব্রেক করলে পিছনের চাকা উঁচু হয়ে পড়ে। কারণ পিছনের চাকায় যে গতি ছিল সেই গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ যদি সামনের চাকা চলা বন্ধ হয়ে যায় তবে পিছনের চাকা বাধা পেয়ে উঁচু হয়ে পড়ে। এজন্যই দ্রুতগামী সাইকেলকে ব্রেক করতে হলে পিছনের চাকায় ব্রেক করতে হয়।

www.pathagar.com

ঠিক ঐ একই কারণে কোনো গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ সামনের চাকা খুলে গেলে পুরা গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে পারে না, কারণ তাতে যে গতি থাকে ঐ গতিই গাড়িটাকে সামনে ঠেলে দেয়। ফলে সামনের চাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে গাড়ি উল্টে যেতে বাধ্য হয়। ঠিক একই কারণে খুব দ্রুতগামী গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করলে সব যাত্রী সামনের দিকে ছিটকে যায়। কারণ যাত্রীর গতি ঠিকই থাকে, কিন্তু গাড়ির গতি বন্ধ করে দেয়া হয়।

'গতিজড়তা' বুঝানোর জন্য অনেক কথা এখানে বলা হলো এবং একই কথা বারবার বলা হলো। আশা করি, এখন আমরা গতিজড়তা বুঝতে পেরেছি।

এবার চিন্তা করুন একটা হেলিকপ্টার যদি সোজা উপরে উঠে গিয়ে ১ ঘণ্টা একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে ঐ ১ ঘণ্টায় পৃথিবী তার আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে গিয়ে ১০৪১ মাইল পূর্ব দিকে চলে যাবে। ঐ সময় হেলিকপ্টারকে ১০৪১ মাইল পিছনে চলে যাবার কথা ছিল। কারণ হেলিকপ্টার তো আর পৃথিবীর গায়ে নেই, সে রয়েছে পৃথিবীর গা ছেড়ে দিয়ে মহাশূন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তা যায় না। কেন যায় না? কারণ হেলিকপ্টারটা ছিল পৃথিবীতে, ফলে পৃথিবীর যে গতি তা হেলিকপ্টারের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সুতরাং যদিও সে উপরে ছিল কিন্তু গতিজড়তার কারণে পৃথিবীর গতিতে সে পৃথিবীর সঙ্গে সমানে চলতেছিল। তাই হেলিকপ্টার যতক্ষণ পরেই পৃথিবীর মাটিতে নামুক না কেন, যেখান থেকে উঠেছিল সেখানেই নামবে।

এই একই কারণে প্লেনে করে মানুষ যেখান থেকে যেদিকেই উড়ুক না কেন, উপরে উঠার কারণে পৃথিবীর গতি উড়ন্ত প্লেনের উপর থেকে এক চুল পরিমাণও কম-বেশি হয় না। ফলে প্লেন পূর্ব দিকে উড়লেও ঘণ্টায় যতদূর যাবে, পশ্চিম দিকে উড়লেও ঐ একই গতিতে ঘণ্টায় তত মাইলই চলবে। কারণ পৃথিবীর গতি প্লেনে সব সময়ই সম-পরিমাণ থাকে।

এবার চিন্তা করুন পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে বছরপূর্তির জন্য যখন সূর্যের চারপাশের প্রায় ৬২ কোটি মাইলের একটা পথ অতিক্রম করে তখন পৃথিবীকে চলতে হয় প্রতিমিনিটে প্রায় ১২ শত মাইল। এভাবে

www.pathagar.com

চললে চাঁদকে তো ছয় মাসে ৩০ কোটি মাইল পিছনে ফেলে পৃথিবীর দূরে সরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা সরে না কেন?

সরে না এই জন্য যে, পৃথিবী সূর্যের চার পাশের ডিম্বাকৃতির ৬২ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীকে যে গতিতে চলতে হয় ঠিক ঐ একই গতিতে চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে তার দূরত্ব ঠিক রেখেই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে।

এখন প্রশ্ন, পৃথিবীর বার্ষিক গতি আর চাঁদকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলার গতি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এক হলো কি করে? এখানেও ঐ একমাত্র কারণে এই দুইটা গতি এক হতে পারে। সে কারণটা হলো, ঐ চাঁদটাকে হেলিকপ্টারের মতো এই পৃথিবী থেকে উপরে উঠতে হবে, তাহলে গতিজড়তার নিয়ম অনুযায়ী চাঁদ সমগতিতে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে পারে, এছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় কারণই আল্লাহর তৈরি আইনের নিয়মে পড়ে না, যে নিয়মের মাধ্যমে চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে একই গতিতে আবহমানকাল ধরে ছুটতে পারে। এটাই আল্লাহর তৈরি বিধান, যে বিধানের মধ্যে রয়েছে গতিজড়তা, আর যার কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি হলেই চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে থাকা সম্ভব, নইলে নয়।

এরপর যদি কেউ বলতে চান যে, আল্লাহর নিকট সবই সম্ভব তাহলে আমি বলবো আল্লাহর নিকট তো সবই সম্ভব–এ কথা ষোল আনা সত্য। কিন্তু একটা গাছের ফল বোটা থেকে ছিঁড়ে গেলে আল্লাহ কি ঐ ফলটাকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারেন না? এটা কি আল্লাহর কাছে অসম্ভব?

অসম্ভব তো অবশ্যই নয়, তবে তা যায় না কেন? এর উত্তরে যেমন বলতে হবে ওটা আল্লাহর বিধান. ঠিক তেমনি পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি এটাও আল্লাহর বিধান। এই যে আটলান্টিক মহাসাগরের বিরাট গভীরতা, হয়ত হতে পারে কোটি কোটি বছর পূর্বে আল্লাহ পাক কোনো বিস্ফোরণের মাধ্যমে পৃথিবীর খানিকটা অংশকে ছিটকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ফলে পৃথিবীর গতি চাঁদের গায়ে লেগে রয়েছে, নইলে অ্যাপোলো ১১-তে করে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে তারা জীবনেও কোনোদিন আর এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারতো না। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর কোনো একটি প্রাণীও কোনোদিনই চাঁদের সন্ধান পেত না যদি না চাঁদের সৃষ্টি পৃথিবী থেকে হতো।

www.pathagar.com

এরপর প্রশ্ন, সূর্য যখন তার নিজস্ব কক্ষপথে ভীষণ বেগে ছুটছে তখন পৃথিবী কি করে তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে? সূর্য যখন তার কক্ষপথে এক নির্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলছে অনবরত তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ক্রমেই বাড়তো এবং কবে সূর্যকে একটা ছোট্ট তারকার মতো দেখা যেত এবং বহু বছর পরে এমন একদিন আসতো যেদিন অন্ততঃ এ সূর্য তো দেখা যেতোই না, হয়তো অন্যকোনো সূর্যের দেশে পৃথিবী ঢুকে পড়তো। কিন্তু তা কেন হচ্ছে না?

হচ্ছে না ঐ একই কারণে। কারণটা হলো এই যে, সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হলে গতিজড়তার আইন অনুযায়ী সূর্যের গতি পৃথিবীতে লেগে থাকবে আর তাতে ফল হবে যে, পৃথিবী সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে বাধ্য থাকবে। কারণ যেদিন সূর্য থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেদিন পৃথিবী সূর্যের গতিকে সঙ্গে নিয়েই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এ কারণেই সূর্য যেদিকেই যাক না কেন এবং যত দ্রুতগতিতেই চলুক না কেন, পৃথিবীকে ছেড়ে সূর্যের অন্যকোনো দিকে পালিয়ে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। ঠিক তেমনি পালিয়ে যেতে পারবে না সূর্য থেকে যারা যারা বেরিয়ে আসছে তাদের একটিও। এসব কি আমরা কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি? এসব কি বিনা ব্যবস্থাপনায় হতে পারে?

১৩ নং যুক্তি
সবকিছুই আল্লাহর ভাণ্ডারে

আমরা একদিকে শুনি মানুষ বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু জমিন বাড়ছে না। অন্যদিকে আল্লাহ কুরআনের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ *

অর্থ ঃ সবকিছুর ভাণ্ডার আমার নিকট। আমি প্রয়োজনমতো সবকিছুই দিয়ে থাকি।

এবার দেখা যাক এ দু'টি মতের কোনটা ঠিক। আল্লাহ বলেছেন, সব কিছুর ভাণ্ডার আল্লাহর নিকট এবং প্রয়োজনমতো সবকিছুই দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

তাহলে আমরা মানুষ বেড়ে গেলে আল্লাহকেও জমিন বাড়াতে হবে। যদি লোক বৃদ্ধির সাথে সাথে জমিন বাড়তে দেখি তবে তো আল্লাহর কথা না মেনে আর কোনো উপায় থাকবে না।

আমরা দেখি পৃথিবীতে এমন অনেক পাহাড় পাওয়া গিয়েছে যার উপর অনেক অনেক বছর পূর্বের সামুদ্রিক জানোয়ারের হাড় বা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে এবং সেসব কঙ্কাল দেখে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন ঐসব পাহাড় নাকি একদিন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, পরে পাহাড় গজিয়ে উঠেছে। ফলে সমুদ্রের মধ্যে কিছু জলজ প্রাণীর দেহাবিশেষ এসব পাহাড়ের মাথায় এখন পাওয়া যাচ্ছে।

ইদানীং শুনছি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানার মধ্যে চট্রগ্রামের নিম্নদিকে ৪৪ হাজার বর্গমাইলের এক দ্বীপ জেগে উঠেছে। এতে কি আল্লাহ পাকের উপরিউক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে না?

ঐ দ্বীপে ইতিমধ্যেই গাছপালা লাগানো শুরু হয়ে গেছে। যখন সেখানে লোকবসতি শুরু হয়ে যাবে তখন বাংলাদেশের লোকবসতি হবে প্রতি বর্গমাইলে [৫৬ হাজার বর্গমাইল+৪৪ হাজার বর্গমাইল=১ লক্ষ বর্গমাইল। ১০ কোটি÷১ লক্ষ বর্গমাইল=] ১,০০০ জন লোক। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে আমরা এখন যেখানে ১৭৮৫ জন লোক বাস করছি সেখানে এই গড়টা গিয়ে দাঁড়াবে ১,০০০ জনের মধ্যে।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–'সবকিছুর ভাণ্ডার আমার নিকট। যখন যা যে পরিমাণ প্রয়োজন হয় তখন তা সেই পরিমাণ আমি দিয়ে থাকি।'

পৃথিবীর স্থলভাগ বৃদ্ধির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের এ কথার সত্যতা অবশ্যই প্রমাণিত হলো। এবার দেখা যাক আর কোনোদিক থেকে আল্লাহর উপরিউক্ত বাণীর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

আমরা দেখি বাংলাদেশের মানুষ যখন জ্বালানি কাঠের চিন্তায় অস্থির ছিল তখন হঠাৎ করে আল্লাহ পাক তিতাস গ্যাসের সন্ধান মিলিয়ে দিলেন, ফলে কোটি কোটি টাকার জ্বালানির অভাব থেকে আমরা মুক্তি পেলাম।

উপরিউক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহর ওয়াদাই রয়েছে যে, যখন যা যে পরিমাণ প্রয়োজন হবে তা পূরণ করার দায়িত্ব আল্লাহর।

www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাক খাদ্যের অভাব পূরণ করার কোনো ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন কি না।

আমরা ভৌগোলিক হিসাব ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি যে, পৃথিবীর স্থলভাগ সমভাবে ভাগ করলে এখনো মাথাপিছু প্রায় ৮ একর করে জমি ভাগে পড়বে। এ পরিমাণ জমিতে যদি সর্বনিম্নহারেও ফসল উৎপন্ন হয় তবু বর্তমানের জনসংখ্যা অনুপাতে খাদ্যঘাটতি থাকার কথা নয়। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই যে, আল্লাহ জমিন দিয়েছেন, জমিনে উর্বরা শক্তি দিয়েছেন। গাছের খোরাক নাইট্রিক অ্যাসিড আকাশ থেকেই পানির সঙ্গে মিশিয়ে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষাণ। কিন্তু জমি চাষ করার ও বীজ বোনার দায়িত্ব আল্লাহর নয়, তা মানুষের।

ঠিক তেমনি তিতাস গ্যাস দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, কিন্তু পাইপ বসিয়ে মানুষের রান্নাঘর পর্যন্ত সে গ্যাস পৌঁছে দেয়া মানুষের দায়িত্ব। তেমনি এই পৃথিবীতেই পৃথিবীর মোট মানুষের উপযোগী খাদ্যের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখা আল্লাহর দায়িত্ব, কিন্তু খাদ্য উৎপাদন ও তা সমভাবে বণ্টনের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া মানুষের দায়িত্ব। বলাবাহুল্য, এসব দায়িত্ব পালনের জন্যই থাকে সরকার। এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ঃ

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ .....

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ আকাশে যেমন ন্যায়দণ্ড ও ভারসাম্য কায়েম করেছেন তোমরাও তেমনি করো।

অর্থাৎ ১. আকাশ থেকে তোমরা যে সূর্যের কিরণ, বৃষ্টির পানি, চাঁদের আলো ও আকর্ষণ যেমন প্রত্যেকেই সমানভাবে পাও তেমনি জাতীয় সম্পদের ভাগটাও জনগণকে সমানভাবে ভাগ করে দাও। ২. আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রত্যেকেরই যেমন নিজস্ব আকর্ষণ ও অবস্থান থাকার কারণে একটি অন্যটিকে আকর্ষণ করে নিজের মধ্যে টেনে নিতে পারে না তেমনি দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব সহায়-সম্বল, ঘর-বাড়ি ও স্বাধীন সত্তা থাকতে হবে যেন কেউ কাউকে আকর্ষণ করে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে গোলাম বানাতে না পারে।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহর পৃথিবীতে রয়েছে এবং সেগুলোকে আল্লাহ ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে বলেছেন। যদি আমরা সারা পৃথিবীর মানুষ গোটা পৃথিবীকে 'কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুল্‌ক' অর্থাৎ 'বলো, হে আল্লাহ! তুমিই এ বিশ্বজাহানের বাদশাহ' মুখে বলে বাস্তবে এ কথা অন্তর থেকে মেনে নিয়ে পৃথিবীর জায়গা-জমি ও ধন-সম্পদ সারাবিশ্বের মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করে দিতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই কোনো দেশকেই বাড়তি জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তা করতে হতো না।

যেমন দেখুন অস্ট্রেলিয়া একটি মহাদেশ হওয়া সত্ত্বেও তার লোকসংখ্যা বাংলাদেশের লোকসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। আরব দেশে ২৫টা বাংলাদেশের সমান জায়গা হওয়া সত্ত্বেও তার লোকসংখ্যা আমাদের দশ ভাগের এক ভাগ। কানাডা বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় ৭৫ গুণ বড় হওয়া সত্ত্বেও এর লোকসংখ্যা মাত্র বাংলাদেশের অর্ধেক। পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যাদের লোকসংখ্যা বাংলাদেশের যেকোনো একটা জেলার লোকসংখ্যার চেয়েও কম। এই হিসাব অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়েনি। বেড়েছে শুধু বাংলাদেশের লোকসংখ্যা।

মানুষের খাদ্য সমুদ্রে

আল্লাহ বলেন ঃ

وَ هُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا *

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন যেন তা থেকে তোমরা টাটকা গোশত খেতে পারো। (সূরা আন-নহল ঃ ১৪)

এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, আমরা সমুদ্র থেকে যে মাছ খাই তাকে আরবীতে বলে سَمَكٌ (সামাকুন)। আর لَحْمٌ (লাহমুন) বলতে বুঝায় মাংস। এ মাংস এখনো আমরা সমুদ্র থেকে খুঁজে বের করতে পারিনি। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্র থেকে হয়ত এমন খাদ্য আবিষ্কার হবে যার মধ্যে টাটকা গোশতের যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান থাকবে।

www.pathagar.com

১৪ নং যুক্তি
আল্লাহ পাকের সৃষ্টিনিয়ন্ত্রণ

দেখুন, মানুষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণ আর আল্লাহ করেন সৃষ্টিনিয়ন্ত্রণ। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ * وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلَّا عِنْدَنَا

অর্থ ঃ যা যে পরিমাণ প্রয়োজন হয় তা সেই পরিমাণই দিয়ে থাকি।

এর থেকে আরও বুঝা যায় যে, আমরা যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করি, তার দায়িত্ব আসলে আল্লাহ নিজেই নিজের উপর নিয়ে রেখেছেন।

এবার দেখা যাক আল্লাহর এ কথার সত্যতা বাস্তবে মেলে কি না এবং তার সৃষ্টিনিয়ন্ত্রণ কেমন।

এটা পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, আল্লাহর সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে তিনি যত ধরনের জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ প্রজননশক্তি এবং গাছের মধ্যে রয়েছে বংশবৃদ্ধির অজস্র উপাদান। প্রাণীর মধ্যে যে পরিমাণ প্রজননশক্তি রয়েছে যদি সেই পরিমাণ শক্তি অনুযায়ী বংশবিস্তার হতে পারতো তবে মাত্র ১ জোড়া প্রাণীর বংশে কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর স্থলভাগ এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যেত যে, অন্যকোনো প্রাণীর জন্য এক বর্গইঞ্চি জায়গাও খালি পাওয়া যেত না।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, যৌনমিলনের সময় একজন পুরুষের দেহ থেকে ১ বারে যে পরিমাণ বীর্য নির্গত হয় তাতে ৩০/৪০ কোটি নারী গর্ভবতী হতে পারে, কিন্তু তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে বলে সে সুযোগ নেই।

আবার দেখুন একটা সন্তানের দেহ তার মায়ের পেটে বিন্দু থেকে শুরু করে গর্ভকালীন ৯ মাসে যে হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদি সেই একই হারে মাত্র ২১ বছর মানবদেহ বৃদ্ধি পেতে থাকতো তবে তার দেহের আয়তন সারা পৃথিবীর আয়তনের সমান হয়ে যেত। কিংবা ১টা ছেলে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত যে হারে লম্বা হয় সে হারে লম্বা হতে থাকলে যার বয়স ২০× ৪=৮০ বছর হয়েছে তার দেহের দৈর্ঘ হতো ৩×৪$\frac{১}{২}$=১৪ হাত। কিন্তু তা হয় না কেন? কারণ সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তাই হয় না।

www.pathagar.com

দেখুন, সমুদ্রে 'Star Fish' নামে একধরনের মাছ আছে যারা একবারে প্রায় ২০ কোটি ডিম দেয়। যদি তাদের মাত্র ১টি মাছের বংশ পূর্ণরূপে বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ দেয়া হতো তবে মাত্র ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে এক বর্গইঞ্চি জায়গাও (অন্যকোনো প্রাণীকে দাঁড়ানোর জন্য) খালি থাকতো না। এসব ব্যাপারে কি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ নেই?

পৃথিবীতে এক ধরনের উদ্ভিদ আছে যার নাম 'সিসিস্ট্রীয়াম সোফিয়া'। এ জাতীয় গাছের একটি চারাগাছেই একবারে সাড়ে সাত লাখ বীজ দেয়। যদি এর মাত্র একটি গাছের পূর্ণাঙ্গভাবে বংশবৃদ্ধির সুযোগ মিলতো তবে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর স্থলভাগ এই এক জাতীয় গাছেই ছেয়ে যেত।

আরো লক্ষ্য করুন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে জীবিত জীবের জীবকোষের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণক্ষমতা এত বেশি যে, তাকে সীমাহীন বলা চলে। এমনকি Unicelluler 'Organism' নামীয় জীবকোষের সম্প্রসারণক্ষমতা এত বেশি যে, যদি রীতিমতো তার খাদ্য সরবরাহ হয় এবং তার নিজেকে পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকে তবে মাত্র ৫ বছরের মধ্যেই এত পরিমাণ জীবকোষের সৃষ্টি হতে পারে যে, তার মিলিত আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১০ হাজার গুণ বেশি হতে পারে।

এবার চিন্তা করুন, যদি এর পিছনে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কার্যকর না থাকতো তবে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবী টিকতে পারতো কি? এবং আমরা এ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণের কোনো সুযোগ পেতাম কি?

১৫ নং যুক্তি
ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ

এবার আসুন ডারউইনের 'ক্রমবিকাশবাদ'-এর উপর কিছুটা চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। ডারউইনের মতে, আমরা নাকি ক্রমবিকাশবাদের ধারা অনুযায়ী ব্যাঙ, বানর ও বনমানুষের পর্যায় পার হয়ে মানুষ হয়ে পড়েছি। তাই যদি হয় তবে আমার প্রশ্ন ঃ

১. যতদিন থেকে ইতিহাস সংরক্ষিত হচ্ছে ততদিনের মধ্যে কোনো একজন মানুষের সামনেও কেন একটা 'বানর' মানুষ হলো না? অর্থাৎ হাজার হাজার বছরের মধ্যে একটা লোকও কেন দেখলো না যে, তার সামনে একটা বানর মানুষ হয়ে গেল?

www.pathagar.com

তারা হয়তো বলবেন–'যা হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে তা কি করে একটা মানুষ চোখে দেখবে?' এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন, হাজার হাজার না হয়ে লাখ লাখ বছরে হোক, কিন্তু পরিবর্তন হয়ে বানর ও মানুষের মাঝামাঝি পর্যায় এসে গেছে এমন অবস্থায় তো দেখা যাবে? তা-ও কি দেখা যাচ্ছে? অথচ শুয়া পোকা থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেই একটা প্রজাপতি বেরিয়ে আসে।

আমরা দেখি শুয়া পোকা থেকে প্রজাপতি জন্মলাভ করে। সেহেতু 'বানর' থেকে যদি 'মানুষ' হতো তাহলে উচিত ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে শুয়া পোকা থেকে যেমন প্রজাপতি হয় তেমনি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 'বানর' থেকে একটা 'মানুষ' হওয়া।

কিন্তু তা কেন হয় না? তাহলে কি বলতে হবে যে, বানর থেকে যারা মানুষ হয়েছে তারা বহু পূর্বের কোনো এক শুভক্ষণে হয়ে গেছে, এখন আর হবে না? এক্ষেত্রে আমার পুনরায় প্রশ্ন যে, এককোষা প্রাণী থেকেই যদি আমরা মানুষ হয়ে থাকি তবে কোটি কোটি বছর পার হয়ে যাওয়ার পর আজও কেন সে এককোষা প্রাণীই হয়ে রয়েছে? তারা পরিবর্তিত প্রাণীতে এখনো কেন রূপান্তরিত হচ্ছে না? তাছাড়া ক্রমবিকাশবাদের থিওরী বলে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার ধারা। কিন্তু প্রথম অবস্থা (First Cause) যার থেকে বিবর্তন শুরু হয় তার সৃষ্টি হলো কি করে? এর জবাব কিন্তু আজ পর্যন্তও কেউ দিতে পারেনি। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে এ প্রশ্নের জবাব কেউই কোনোদিন দিতে পারবে না।

বানরের লেজ খসে মানুষ

বিজ্ঞান বলে নিষ্প্রয়োজনের কারণে বানরের লেজ খসে গেছে। তাই যদি হয় তবে এখন তো মানুষের পাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সে পাখা কেন গজাচ্ছে না? যদি এমন হয় যে, যা একবার খসে পড়ে তা প্রয়োজনের তাগিদে পুনরায় গজায় না, তাই যদি হয় তবে বানরের পূর্ব অবস্থায় তো লেজ ছিল না, পরে বানর সে লেজ পেল কি করে?

উক্ত উদ্ভট মতকে ব্যঙ্গ করে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ভবিষ্যতের মানুষ' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানীদের উক্ত থিওরী ঠিক হলে ভবিষ্যতে মানুষের শুধু মাথাটাই থাকবে এবং তা আরো খানিকটা বড় হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন এ থিওরীও টিকছে কি? এসব যুক্তিগুলো আল্লাহ খণ্ডন করে দিয়ে বলেছেন ঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ * ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ الْخَٰلِقُونَ *

অর্থ ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করে দেখো না যে বীর্য তোমরা নিক্ষেপ করো তা কী? (অর্থাৎ কি ধরনের গুণ ও শক্তিসম্পন্ন) তা তোমরা কি নিজেরাই সৃষ্টি করতে পারো নাকি আমি সৃষ্টি করে থাকি? (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৫৮–৫৯)

এর মাধ্যমে আল্লাহ বলছেন বীর্যের দিকে লক্ষ্য করতে বা পরীক্ষা করতে। সে পরীক্ষায় ধরা পড়লো, বীর্যের মধ্যে এমন কিছু নির্দিষ্ট উপাদান রয়েছে যার থেকে পিতার ও মাতার অনুরূপ একটা সন্তান জন্ম হতে পারে। অর্থাৎ পিতা-মাতার লেজ থাকলে তাদের বীর্যের মধ্যে লেজ তৈরির উপাদান থাকবে এবং লেজ তাতে তৈরি হবে।

কিন্তু যদি পিতা-মাতার বীর্যের মধ্যে লেজের বা শিং-এর কোনো উপাদান না থাকে তবে তাদের সন্তানদের লেজ, শিং ইত্যাদি হবে না। এমনকি আমরা দেখছি পিতা-মাতার গায়ের রংটাই নয় শুধু, বরং চোখের মণির রংটাও পর্যন্ত সন্তানের পিতা-মাতার অনুরূপ হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এই বিধানই ডঃ ফ্রয়েডের পরীক্ষায় ধরা পড়লো।

তিনি বললেন–'পিতার বীর্যে লেজের উপাদান না থাকলে তার সন্তানের লেজ হবে না।' ফলে ডারউইনের থিওরী ডঃ ফ্রয়েডের থিওরী দ্বারা খণ্ডিত হয়ে গেল।

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে, 'বানর' থেকে পর্যায়ক্রমে 'মানুষ' জন্মলাভ করেছে তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে বানর ও মানুষের মধ্যে না হয় সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে? বানরের মধ্যে মানুষের মতো বাকশক্তি নেই, বিবেক-বিবেচনাবোধ নেই। মানুষের মতো লজ্জা-শরম এবং গর্ব-অহংকারও নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে তা আছে। এগুলো মানুষের মধ্যে এলো কোত্থেকে এবং বিকাশ লাভ করলো কিভাবে?

www.pathagar.com

১৬ নং যুক্তি

জীবের বৈশিষ্ট্য

ক) জীবের চেহারা-সুরত

আমরা দেখি যাদেরকে আলাদাভাবে চেনার প্রয়োজন আছে তাদেরই চেহারার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখি মানুষ নিজ হাতে যে জিনিস তৈরি করে তাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের প্রতিটি জিনিস বা যন্ত্র একই রকম হয়। যেমন মানুষের তৈরি থালা, বাটি, গ্লাস, দা, খন্তা, কুড়াল ইত্যাদির চেহারা-সুরত একই রকমের হয়। কিন্তু আল্লাহর তৈরি মানুষের চেহারা একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই। যদি এখানে চেহারার পার্থক্য আল্লাহ পাক না সৃষ্টি করতেন তাহলে কে মা, কে বোন, কে স্ত্রী, কে পিতা, কে বন্ধু, কে শত্রু, কে আমার দেশের প্রেসিডেন্ট, কে আমার দেশের চরম শত্রুরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তার কিছুই বুঝা যেত না। ফলে মানবসমাজ অচল হয়ে পড়তো। তাই প্রতিটি মানুষের চেহারার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে প্রত্যেককে চেনার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।

আবার দেখুন আল্লাহর কি বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা যে, যেসব গৃহপালিত পশু-পক্ষী মানুষের মালিকানায় রয়েছে সেগুলো যেহেতু চেনার প্রয়োজন আছে তাই তাদের চেহারার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু পানির মাছ যেহেতু কারো মালিকানায় নেই তাই তাদের চেহারার মধ্যে কোনো পার্থক্যও নেই। মানবজাতির প্রয়োজনে তাদের চেহারা সৃষ্টির কথা আল্লাহ এভাবে বলেছেন ঃ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ *

অর্থ ঃ তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী যাকে যে চেহারায় খুশি সৃষ্টি করেছেন।

খ) দৃষ্টিশক্তি

আল্লাহ মানুষের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির একটা ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ -ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছেন। মানুষের যা দেখা প্রয়োজন তাই মানুষ দেখে, আর যা দেখার প্রয়োজন নেই বরং দেখলে ক্ষতি হবে, তা মানুষ দেখে না। যেমন মানুষ পানি দেখতে পায়, কিন্তু বায়ু দেখতে পায় না। মাছের নিকট পানি যেমন মানুষের নিকট বায়ু তেমন।

www.pathagar.com

মানুষ যা দেখে তা অন্য যেকোনো দেখার মতো জিনিসকে আড়াল করে। যেমন পানিকে দেখা যায় বলেই পানির মধ্যে ডুব দিয়ে চেয়ে দেখলে পানি চোখের উপর এসে আড়াল করে, ফলে পানির মধ্যকার আর কিছুই দেখা যায় না। বায়ুকে আল্লাহ দেখার মতো কোনো বস্তু বানালে মানুষ চেয়ে শুধু বায়ুই দেখতে পেত, আর কিছুই দেখতে পেত না।

শুধু তাই নয়, মানুষ বায়ুর মধ্যকার কোনো গ্যাসীয় পদার্থও দেখতে পায় না এবং জিনও দেখতে পায় না। এবার চিন্তা করুন মানুষের যা দেখলে উপকার হয় তাই দেখে, আর যা দেখলে তার ক্ষতি হবে, মানুষ তা দেখতে পায় না। এরও পিছনে কি কোনো পরিকল্পনা নেই?

গ) গলার আওয়াজ ও শ্রবণশক্তি

আওয়াজ শোনার ব্যাপারেও আল্লাহর অনেক ধরনের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা রয়েছে। দুনিয়ার মানুষ অনেক রকমের আওয়াজ তৈরির যন্ত্র তৈরি করে। যেমন সাইকেলের বেল, রেলগাড়ির হুইসেল, মটর-বাসের হর্ন ইত্যাদি ধরনের যন্ত্রের মাধ্যমে আওয়াজ করা হয়। কিন্তু কোনো আওয়াজ শুনেই মানুষ বলতে পারে না যে কোন গাড়ির হর্ন বা কোন সাইকেলের বেল বা কোন বাঁশির আওয়াজ। কারণ মানুষের তৈরি শব্দযন্ত্রের মধ্যে মানুষ কোনো বিভিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর তৈরি মানুষের গলার আওয়াজে তা রয়েছে।

সাইকেলের প্রত্যেকটি বেল থেকে যেমন একই ধরনের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ আসে তেমনি যদি প্রতিটি মানুষের গলা থেকে একই ধরনের আওয়াজ আসতো তবে রাতে কেউ গিয়ে যখন দরজা খুলে দেয়ার জন্য ঘরের লোকদের ডাক দিতো তখন সে ব্যক্তি কি প্রকৃতই বাড়ির মালিক, না চোর-ডাকাত, না চরম শত্রু তা বুঝা যেত না। তাই মেহেরবান আল্লাহ মানুষের গলার আওয়াজকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন গলার আওয়াজ শুনেই মানুষ বুঝতে পারে যে, কে ডাকছে। এছাড়া আওয়াজ তৈরির আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও কর্ণকুহরের পাতলা পর্দায় বোধগম্য শব্দ হিসেবে তা ধরা পড়ার ব্যবস্থা এসব কি আপনা আপনিই হতে পারে? বরং এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে মানুষের মন আপছে বলে উঠবে ঃ

* وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ 'তিনি সবকিছু করার জন্যই ক্ষমতা রাখেন।' আর ক্ষমতা রাখেন বলেই তিনি এতসব ব্যবস্থাপনার

www.pathagar.com

মাধ্যমে তার সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন। এসব বিষয়ে মানুষ যেন চিন্তা-ভাবনা করে সেজন্য আল্লাহই বলেছেন ঃ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا *

অর্থ ঃ অবশ্যই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং মনোবৃত্তি এর প্রত্যেকটির সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

অর্থাৎ পরকালে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও মনোবৃত্তি দিয়েছিলাম–এসবের কি সদ্ব্যবহার করেছিলে?

১৭ নং যুক্তি
আকাশের ভাসমান মেঘের হাকীকত

আল্লাহ বলেন ঃ يٰسٓ * وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ *

অর্থ ঃ ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ .....। (ইয়াসীন ঃ ১-২)

কুরআন যেমন বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ ঠিক তেমনি সৃষ্টির যেখানে দৃষ্টিপাত করা যাবে সেখানেই দেখা যাবে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান। এই কারণেই

আল্লাহ বলেন ঃ فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ *

অর্থ ঃ চেয়ে দেখো আল্লাহর সৃষ্টির দিকে। কোনো অবিজ্ঞোচিত টুটাফাটা ধরনের কোনো কিছু তার সৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাও কি? তা পাবে না বরং যতই দেখবে ও চিন্তা-ভাবনা করবে ততই ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল কিছুই তুমি বুঝে উঠতে পারবে না। (সূরা মুলক ঃ ৩)

দেখুন সূর্যের কিরণে প্রথমে উত্তপ্ত হয় জমিন। জমিন থেকে সে কিরণ ক্রমে উপরে ওঠে আর অল্প অল্প করে শীতল হতে থাকে। আল্লাহর এমন ব্যবস্থা যে, বায়ু যত উত্তপ্ত হবে ততই হালকা হবে ও জলীয় বাষ্প ধারণ করবে। আর যতই বায়ু ঠাণ্ডা হবে ততই সংকুচিত হবে ও জলীয় বাষ্প ছেড়ে দিবে। সূর্যের কিরণে জমিন যেহেতু উত্তপ্ত হয়ে জমিনের উপরিভাগ প্রায় মাইলখানেক পর্যন্ত সর্বদাই উত্তপ্ত থাকে তাই এই অংশের মধ্যে বায়ু

www.pathagar.com

শীতল হতে পারে না, ফলে সংকুচিতও হতে পারে না। আর বায়ু সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত জলীয় বাষ্পও বায়ু থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে প্রায় ১ মাইলের মধ্যে মেঘ সৃষ্টি হতেই পারে না। আর যেহেতু উপরে তাপ কম তাই জলীয় বাষ্প বহন করে বায়ু উপরে উঠলেই তা শীতল হয়ে সংকুচিত হয়, ফলে জলীয় বাষ্প আর সে ধরে রাখতে পারে না, ছেড়ে দেয়। আল্লাহ পকের এই বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই মেঘ উপরে হয়, নিচে হতে পারে না।

১৮ নং যুক্তি
মেঘের পানি সম্পর্কে

বৃষ্টির কারণ সম্পর্কে আমরা জানি যে বায়ু বিশেষ নিয়মে উত্তপ্ত হওয়ার পরে সম্প্রসারিত হয়ে জলীয় বাষ্প ধারণ করে এবং সে জলীয় বাষ্প বায়ুর সঙ্গে উড়ে উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং আরো ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হয়ে জলীয় কণাগুলোকে একত্রিত করে দেয়। ফলে পানির একটি ফোঁটা তৈরি হলেই তাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি জমিনে টেনে নিয়ে আসে। এ ব্যবস্থা আপনাআপনিই হতে পারে না। এর পিছনেও যে একটা ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা বোঝানোর জন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ * ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ *

অর্থ ঃ তোমরা যে পানি পান করো তার দিকে লক্ষ্য করে দেখো না যে আমি কোন বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেঘ তৈরি করি এবং তার থেকে পানি বর্ষাই। এই নিয়ম-পদ্ধতিতে কি তোমরা মেঘ তৈরি করে নিয়ে পানি বর্ষাতে পারো? নাকি আমি তা করে থাকি? (সূরা আল-ওয়াকিয়া ঃ ৬৮-৬৯)

আল্লাহ বলেন ঃ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ *

অর্থ ঃ যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে (যে লোনা পানির ভিতর থেকে মিঠে পানি বাষ্পাকারে তুলে আনি সেখান থেকে লোনা পানি বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে) লোনা পানিই বর্ষাতে পারতাম। (তোমাদের ক্ষতি হবে বলে তা করি না) তবু তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো না।

(সূরা আল-ওয়াকিয়া ঃ ৭০)

www.pathagar.com

আল্লাহ পানি সম্পর্কে যে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছেন তা শুধু এক ব্যাপারেই নয় বরং পানি সম্পর্কে চিন্তা করলে আরো অনেক বিষয় মানুষের মগজে ধরা পড়ে। যেমন প্রত্যেক তরল পদার্থ জমাট বাঁধলে তা ভারি হয়, কিন্তু একমাত্র পানিই জমে বরফ হলে তা হালকা হয় এবং তরল পানির উপর তা ভাসে। যদি বরফও ভারি হয়ে পানিতে ডুবে যেত তাহলে হিমমণ্ডলের নদী কিংবা মেরু অঞ্চলের সমুদ্রের জমাট পানির বিরাট বড় বরফের খণ্ডগুলো যদি পানির নিচে গিয়ে পড়তো তবে সামুদ্রিক জীব-জানোয়ারগুলো পিষ্ট হয়ে মারা যেত। এর হাত থেকে সামুদ্রিক জীবগুলোকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ একমাত্র জমাট পানিকেই তরল পানির উপর ভাসিয়ে রাখেন। এসব বিষয় চিন্তা করলে কি মন বলবে যে এসব কোনো পরিকল্পিত সৃষ্টি নয়? এসবও কি কোনো বিস্ফোরণের ফল?

আল্লাহ বলেন ঃ * فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِى الْأَلْبَابِ

অর্থ ঃ হে মস্তিষ্কের অধিকারীগণ, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো। দেখো তোমার চিন্তায় কি ধরা পড়ে।

১৯ নং যুক্তি
পাকস্থলী সম্পর্কে

এবার আসুন আল্লাহ যে আমাদের চিন্তা করতে বলেছেন, তাই কিছু চিন্তা-ভাবনা করি। চিন্তা করি পাকস্থলী সম্পর্কে।

দেখুন পৃথিবীতে যত ধরনের রাসায়নিক পরীক্ষাগার আছে আর সেগুলোতে যত প্রকার বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে মানবদেহের পাকস্থলী তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। এই পাকস্থলীরূপ কারখানাটির প্রধান কর্তব্য হলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু হতে প্রাণশক্তি সৃষ্টি করা এবং জীবকোষের চাহিদা মিটানোর জন্য তা দেহের সর্বত্র সরবরাহ করা। মানুষ যা খায় তার কোনো খোঁজ-খবরই সে রাখে না যে পাকস্থলীতে গিয়ে তা কি অবস্থার সৃষ্টি করে।

যেমন মানুষ কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই খাদ্যকে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর সে খাদ্য পাকস্থলীরূপ কারখানায় গিয়ে পাচক রসের সঙ্গে

www.pathagar.com

মিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় ও তা থেকে সৃষ্টি হয় অসংখ্য অনুপ্রাণ এবং তা সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষে সাপ্লাই হয়ে যায়। সেখান থেকে জীবকোষ আবার যেখানে যতটুকু পাঠানো দরকার সেখানে ততটুকু পাঠিয়ে দেয়। এসব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সবল ও সুস্থ রাখেন। চিন্তা করুন, এই ধরনের কত হাজারো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য ও ওষুধ থেকে পাকস্থলীরূপ কারখানায় যেভাবে প্রাণশক্তি ও রোগ প্রতিরোধক শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে তা কি কোনো দৈবক্রমে হওয়া সম্ভব? তাই

আল্লাহ বলেন ঃ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ *

অর্থ ঃ অতঃপর মানুষ লক্ষ্য করুক তার খাদ্যের দিকে, তাহলে সে আল্লাহকে চিনতে পারবে।

আল্লাহর যখন খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করতে বলেছেন তখন শুধু উপরে বর্ণিত বিষয়ই নয় বরং আরো বহু বহু বিষয়ের প্রতি আমরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহ পাকের কত মহান ব্যবস্থাপনা নিহিত রয়েছে এ খাদ্য এবং খাদ্য গ্রহণের মধ্যে। আসুন এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি বিষয় আলোচনা করি।

২০ নং যুক্তি
জিহ্বার কার্য

জিহ্বার দ্বারা আমরা যে শুধু খাদ্য পাকস্থলীতে পাঠাই তাই নয় বরং জিহ্বার দ্বারা সবচেয়ে বড় যে কাজটা সংঘটিত হয় তাহলো জিনিসের স্বাদ। লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, যা-ই দেহের জন্য উপকারী তারই স্বাদটা হচ্ছে সুস্বাদু। আর যার দ্বারাই মানুষের দেহের ক্ষতি সাধিত হবে তা সবই বিস্বাদের। এমন কোনো খাদ্যই নেই যা মানুষের দেহের জন্য পুষ্টিকর বা উপাদেয় আর তার স্বাদ খারাপ বা মুখে ভালো লাগে না। এমন কোনো জিনিস-ই নেই যা মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করবে অথচ তা খেতে খুব সুস্বাদু।

আল্লাহ কেন জিহ্বাকে এ স্বাদ বোঝার ক্ষমতা দিলেন? দিলেন এজন্য যে, খাদ্য গ্রহণের সময় যদি হঠাৎ এমন কোনো জিনিস তার খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় যা তার পাকস্থলীতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাহলে তা যেন মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় ধরা পড়ে যায় এবং বিস্বাদের কারণে

www.pathagar.com

তা যেন সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মুখ থেকে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলি করে গলাটা পরিষ্কার করে নেয়। যেমন–

১. কিছু ছোট ছোট পোকা আছে যা দেহের জন্য বিষ সমতুল্য সেসব পোকার গায়ে ভীষণ দুর্গন্ধ ও স্বাদে অস্বাভাবিক তিক্ত।

২. যা-ই পুষ্টিকর বা দেহের জন্য উপাদেয় তা সবই যদিও সুস্বাদ তবু পাকস্থলী যখন দুর্বল অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য হজম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন সে (পাকস্থলী) জিহ্বাকে জানিয়ে দেয় যে, এখন আর কিছু এখানে পাঠিও না। কারণ আমি (পাকস্থলী) এখন দুর্বল। তখন যা–ই সে খেতে যাবে তা-ই তার মুখে বিস্বাদ লাগবে।

৩. যখন পাকস্থলী দুর্বল বা তাতে অস্বাভাবিক কোনো কিছু ঘটে তখন তা জানিয়ে দেয়ার জন্য জিহ্বার উপরে সাদা রং-এর একটা আবরণ পড়ে যায় যা পাকস্থলীর অবস্থার কথা বলে দেয়। জিহ্বার উপরের আবরণের রং যে শুধু সাদাই হয় তা নয়, মাঝে খয়েরী রঙেও পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই রঙের বিভিন্নতা তার পাকস্থলীর দুর্বলতার বা অসুস্থতার ধরন কেমন তা-ও বলে দেয়। অর্থাৎ তার কি ছোট-খাট কোনো রোগ হয়েছে, নাকি টাইফয়েড হয়েছে তা জিহ্বা বলে দেয়। এভাবে প্রতিটি রোগেরই একটা পরিচয় ভেসে ওঠে মানুষের চেহারায় বা দেহের উপরিভাগের যেকোনো স্থানে যেন দেহের ভিতরে কি রোগ সৃষ্টি হলো তা চেহারা দেখেই ধরতে পারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। যেমন দেখুন–

১. **পেটে কৃমি হয় ঃ** কৃমি রক্ত খেয়ে যখন রক্তশূন্য করে দেয় তখন চোখের শিরাগুলোর রঙে তা ধরা পড়ে, জিহ্বার স্বাদে ধরা পড়ে, হাত-পায়ের রঙেও ধরা পড়ে।

২. **লিভারের জণ্ডিস হয় ঃ** চোখের রং হলুদ হয়ে যায়, চোখ দেখেই মানুষ দ্রুত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে।

৩. **কিডনী খারাপ হয় ঃ** এতে প্রস্রাব কমে যায়, শরীর ফুলে ওঠে, মানুষ টের পেয়ে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

৪. **প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার যাচ্ছে ঃ** তাতে চিকিৎসা হতে হবে, তার হাত-পা ঝিনঝিন করে, শরীরের উপরিভাগের অর্থাৎ চর্মের মসৃণতা নষ্ট হয়ে যায়, ক্ষুধা-পিপাসা বৃদ্ধি পায়, তাকে সিগন্যাল দেয় যে, তোমার বহুমূত্র রোগ হয়েছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।

www.pathagar.com

৫. **ঠাণ্ডায় ফুসফুসকে আক্রমণ করেছে ঃ** গলায় নিঃশ্বাসে ও নাকে তা ধরা পড়ে, মানুষে হুঁশিয়ার হয়, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এইভাবে প্রত্যেকটি রোগের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে কোনো না কোনো সিগন্যালের ব্যবস্থা রয়েছে।

২১ নং যুক্তি
বায়ুর মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ

বায়ুর মধ্যেও কতগুলো গ্যাসীয় পদার্থ যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে রয়েছে। যার নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যতিক্রম হলেই গোটা বায়ুমণ্ডলীতে আগুন ধরে যেতে পারে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সারা পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই শতকরা হারের যে ব্যতিক্রম হয় না এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যে হার রয়েছে যাতে গোটা পরিবেশটাই শান্ত অবস্থায় মানুষ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী হয়ে রয়েছে তা কি কোনো মহাশক্তিধরের বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা ছাড়াই সম্ভব? কোনো যুক্তিবাদী ব্যক্তিই বলতে পারে না যে তা সম্ভব।

২২ নং যুক্তি
শ্বাসযন্ত্র

চিন্তা করুন শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করে! দেখুন প্রতিমিনিটে ১৪/১৫ বার নিঃশ্বাস নিতে হয় এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিমিত অক্সিজেন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তা যথাস্থানে গিয়ে জীবদেহের প্রয়োজন মিটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেহের জন্য যা পরিত্যক্ত (গ্যাসীয় পদার্থ) তা বের করে নিয়ে আসে। এ শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য এমনভাবে চালু থাকে যে, যে গ্যাসটা ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে তা আর ভিতরে প্রবেশ করে না, তা সংশোধিত হওয়ার জন্য সোজা সাপ্লাই হয়ে চলে যায় গাছের পাতায়, আর সেখানে সংশোধিত হয়ে পুনরায় চলে আসে প্রাণীর নাকে। এভাবে অদৃশ্যমান জগতে প্রাণীর প্রশ্বাসে গাছের ও গাছের প্রশ্বাস জীবের দেহে যে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছে যার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হলে পৃথিবীর প্রাণীকুল মরে নিঃশেষ হয়ে যেত। এসব ব্যবস্থাপনা কি আপনাআপনিই হতে পারে?

www.pathagar.com

২৩ নং যুক্তি
হার্ট ও শিরা-উপশিরার কার্যকলাপ

প্রাণীর দেহে হার্টের কাজ হলো প্রতিমিনিটে কমপক্ষে ৭০/৭২ বার দেহের সর্বত্র বিশুদ্ধ রক্ত সাপ্লাই দেয়া ও সঙ্গে সঙ্গে দেহের সবস্থান থেকে রক্তের দূষিত অংশকে রক্ত শোধনাগারে এনে পৌঁছে দেয়া ও তা সংশোধন করে সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্বত্র পুনরায় পাঠিয়ে দেয়া। এ ব্যবস্থাপনার মধ্যেও হাজারো ধরনের যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল কার্যকর রয়েছে।

এসব ব্যাপারগুলো বুঝানোর জন্য আল্লাহ সংক্ষেপে বলেছেন, خَلَقَ فَسَوّٰى – 'তিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন।' অর্থাৎ তিনি আসমান, জমিন এবং এর মধ্যবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রসহ সকল কিছু সৃষ্টি করে যাকে যেখানে রাখলে এবং যাকে যে ধরনের আকর্ষণশক্তি দিলে ও গ্রহ-নক্ষত্রের একটা থেকে অন্যটাকে যত দূরত্বে রাখলে তা টিকতে পারবে সেইভাবে হিসাব-নিকাশ করে সবকিছুকে তিনি সুবিন্যস্ত করেছেন।

তাছাড়া মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকেও সৃষ্টি করে তা একটার সঙ্গে অন্যটাকে সেট করা হয়েছে অত্যন্ত নিখুঁত ও বৈজ্ঞানিক পন্থায়। যেমন হাতের জায়গায় হাত, পায়ের জায়গায় পা। এভাবে চোখ, কান, মুখ, হাত ও পায়ের গিরা, আঙ্গুলের ছোট ছোট অংশগুলোর সংযোজন দেহের অভ্যন্তরের সবকিছু বৈজ্ঞানিক পন্থায় সেট করা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কি আপনাআপনি হতে পারে? কস্মিনকালেও তা হতে পারে না।

২৪ নং যুক্তি
স্বপ্ন

মানুষ এমন বহু স্বপ্ন দেখে যার মধ্যে এমন কিছু স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যা ভবিষ্যতে ঘটবে। আর তা ঘটেও থাকে। এ ধরনের স্বপ্নের সঙ্গে আপনিও যেমন পরিচিত আমিও তেমনি পরিচিত। আল্লাহকে বাদ দিলে এসব স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাবে কি?

আমার জীবনে এমন বেশকিছু স্বপ্ন দেখেছি যেমন হয়ত আপনিও দেখেছেন পরবর্তীতে যার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওসব স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা দেয়া যাবে?

আমি আমার জীবনের মাত্র একটা উল্লেখযোগ্য স্বপ্নের কথা বলবো যা দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর পরেও ভুলিনি। তখন পাড়াগাঁয়ে আলেম-মৌলবীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। দেশে কি একটা রোগ যেন মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। তখন এক প্রবীণ মাওলানা সাহেব পরামর্শ দিলেন 'খতমে খাজেগান' পড়াতে।

শুরু হলো খতম পড়ার মতো লোক দাওয়াত দেয়া। আমি তখন একেবারে নিচের ক্লাসের মাদরাসার ছাত্র। আমি খতম পড়ায় অংশ নিতে পারবো মনে করে আমাকে দাওয়াত দিয়েছে, কিন্তু এর পূর্বে আমি কখনো 'খতমে খাজেগান' নামে কোনো খতমের নামও শুনিনি আর তা কিভাবে পড়তে হয় তারও কিছু জানি না।

দাওয়াত পেয়ে দ্বিধা ও সংকোচে ভুগতে লাগলাম। মাসরাসার ছাত্র হয়ে কিভাবে বলি যে, আমি 'খতমে খাজেগান' পড়তে জানি না! ওদিকে না জেনে যে উপস্থিত মজলিসে বোকা বনে যাবো। দাওয়াতের নির্ধারিত দিনের পূর্বের রাতে স্বপ্নে দেখছি একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন–'তুমি খতমে খাজেগান পড়তে ভয় পাচ্ছো কেন? যা পড়তে হয় তা বলে দেই, তুমি মুখস্থ করে ফেলো।'

অতঃপর লোকটি স্বপ্নে বলতে থাকলেন আর আমি মুখস্থ করতে থাকলাম। এভাবে প্রায়ই মুখস্থ হয়ে গেল। এরপর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, কিন্তু কথাগুলো আমার মনে গেঁথে রইলো। ভাবলাম, দেখা যাক কি হয়। দেখলাম খতম পড়তে গিয়ে আমার সেই স্বপ্নে শেখা দোয়া-কালামই মাওলানা সাহেব পড়তে বলছেন। সেহেতু আমি অন্যের কথা বাদ দিয়ে নিজের কথাই ভাবি যে, আল্লাহকে বাদ দিলে এ স্বপ্নের আমিই কি ব্যাখ্যা দিতে পারি?

আমি বিশ্বাস করি এমন সত্য স্বপ্নের সঙ্গে আপনাদের অনেকেই পরিচিত। এমন অনেক নজির আছে যে, কেউ রাতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখেছেন তার পরদিনই কিংবা দু'চার দিনের মধ্যেই তা বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব কি আল্লাহর কুদরত ছাড়া সম্ভব হতে পারে?

www.pathagar.com

২৫ নং যুক্তি
গাছের মধ্যে আল্লাহর তৈরি কারখানা

দেখুন একই স্থানে একই মাটি থেকে একই রস বা খাদ্য সংগ্রহ করে দু'টি গাছ বেড়ে উঠেছে যার একটি নিমগাছ এবং অন্যটি খেজুর গাছ। দেখুন ঐ একই মাটির রস নিমগাছের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছের ভিতরকার আল্লাহর কারখানায় গিয়ে তা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত তিক্ত, আর সেই একই রস খেজুর গাছের মাথায় বসানো আল্লাহর কারখানায় ঢুকেই হয়ে পড়েছে অত্যন্ত মিষ্টি। এই ধরনের প্রত্যেকটি গাছের মধ্যেই আল্লাহ এমনসব কারখানা করে রেখে দিয়েছেন যেখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট খাদ্য তৈরি হয়ে আসছে।

দুনিয়ার কোনো বিজ্ঞানী কি মাটি থেকে রস নিয়ে তা দিয়ে একটা যেকোনো ফল তৈরি করে দিতে পারবে? তা কস্মিনকালেও পারবে না। যদি তা কেউ পারে তবে সেইদিন যেন বলে যে, এখন আর আল্লাহকে বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজন নেই। (নাউযুবিল্লাহ!) এই কথাই আল্লাহ বলেছেন পবিত্র আল-কুরআনে ঃ

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا * وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا *
وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا * وَّمَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ *

অর্থ ঃ অতঃপর আমি জমিনে গাছ উৎপাদন করি যার মধ্যে রয়েছে ফসল, তরি-তরকারি, আঙ্গুর, মুলা, শালগম, তৈলবীজ, খেজুরসহ বিভিন্ন ধরনের ঘন গাছ-পালা, অনেক রকম ফল-ফলাদি এবং ঘন ঘাস যা হবে তোমাদের জন্য (مَتَاعٌ) সম্পদ, ঘরের আসবাবপত্র ও অনেক ধরনের উপকারী জিনিসপত্র এবং খাদ্য (لَكُمْ) তোমাদের জন্য ও (وَلِأَنْعَامِكُمْ) তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য। (সূরা আবাসা ঃ ২৭-৩২)

অর্থাৎ আমরা খাই ধান থেকে চাউল আর গরুতে খায় ধানের খড়। ঠিক তদ্রূপ আমরা খাই ডাল আর আমাদের গৃহপালিত পশুগুলো খায় ডালের ভূষি। এসব কি মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা ছাড়া হতে পারে? কোনো বদ্ধপাগলও বলবে না যে তা হতে পারে।

www.pathagar.com

২৬ নং যুক্তি
গাছে সম্পদ

আল্লাহ বলেছেন, গাছের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য مَتَاعٌ বা 'লাভজনক সম্পদ'। এবার দেখা যাক কি 'লাভজনক সম্পদ' গাছে রয়েছে। আমরা গাছ থেকে যা পাই তার মাত্র কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করছি। যথা ঃ

১. তুলা, যা থেকে তৈরি হয় জামা-কাপড়, লেপ-তোশক, কাঁথা, বালিশ ইত্যাদি অনেক কিছু। ২. রস, গুড়, চিনি-মিসরী ইত্যাদি। ৩. চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারী, খাট, পালঙ্ক এবং ঘরের হাজারো ধরনের আসবাবপত্র। ৪. জলযান ও স্থলযান অর্থাৎ নৌকা, গাড়ি, রিক্সা, গরুর গাড়ি ইত্যাদি ধরনের অনেক কিছু। ৫. উন্নত মানের যানবাহনের বডি। ৬. বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। ৭. দা, খন্তা, কুড়াল, কোদাল ও রাইফেল-বন্দুকের বাট। ৮. রেশমী সূতা ও রাবার। ৯. চা, কফি। ১০. কাগজ, পিচবোর্ড ইত্যাদি। এছাড়া কত হাজারোও ধরনের মূল্যবান সম্পদ আমরা গাছ থেকে পেয়ে থাকি। এসব ছাড়াও গাছের পাতার মধ্যে রয়েছে ফ্রেশ অক্সিজেন তৈরির কারখানা, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত পাচ্ছি ফ্রেশ অক্সিজেন। এসব কি কোনো ব্যবস্থাপক ছাড়া আপনা থেকে হতে পারে? তা অবশ্যই হতে পারে না।

২৭ নং যুক্তি
প্রাকৃতিক সম্পদ

আল্লাহ বলেন, خَلَقَ لَكُمْ – তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য, مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا – যাকিছু সম্পদ জমিনের মধ্যে রয়েছে তা সবই অর্থাৎ আমাদের উপকারার্থে মাটির গভীরে সৃষ্টি করে রেখেছেন বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ, কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস ইত্যাদি কত কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ যা ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। তা কি এমনিই সৃষ্টি হয়ে থাকা সম্ভব? তা কোনোকালেও সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

২৮ নং যুক্তি
বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন গুণাগুণ

দেখুন প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যেই আল্লাহ গুণ বা শক্তি দান করেছেন, আর মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন وَالْحِكْمَة (ওয়াল হিকমাহ) বুদ্ধিমত্তা যার ফলে মানুষ হিকমতের সাহায্যে দ্রব্যের গুণাগুণ আবিষ্কার করে তার থেকে তৈরি করেছে কত হাজারো ধরনের জিনিসপত্র যেমন ওষুধ, কলকারখানা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, দ্রুতগামী যানবাহন, উড়োজাহাজ, রকেট, স্পুটনিক, বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি কত লক্ষ কোটি ধরনের যন্ত্রপাতি যা মানবজাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। এসব কি কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ফল? কোনো মাতালও তা বলবে না।

২৯ নং যুক্তি
পানি ও মাটির মিত্রতা

দেখুন, নিরস শুকনো মাটির সঙ্গে পানি মিশ্রিত হয়ে মাটিকে করে তোলে উর্বর। আর সেই মাটিতে শিকড় গেড়ে মাটি থেকে রস চুষে জন্মাচ্ছে ও বেড়ে উঠছে কত কোটি কোটি কিসিমের গাছপালা। আবার দেখুন সেই পানির সঙ্গে মাটি মিশিয়ে কাদা তৈরি করে সে কাদায় গড়ছে ইট, মেটে হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি ধরনের কত কিছু। ইট থেকে তৈরি হচ্ছে বড় বড় দালান-কোঠা এবং তা থেকে বড় বড় শহর-বন্দর গড়ে উঠছে।

পানির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে পানি আঠালো কিছুকে ধুয়ে মুছে সাফ করে, ময়লা পরিষ্কার করে সেই পানিতেই এত কঠিন আঠালো জিনিস রয়েছে যা মাটির সঙ্গে মিশে মাটির কণাগুলোকে এমনভাবে যুক্ত করে দেয় যা পরে শক্তি প্রয়োগ করেও বিচ্ছিন্ন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এসব কি আপনাআপনি হতে পারে?

৩০ নং যুক্তি
সম্পদ বণ্টনে আল্লাহর বিধান

লক্ষ্য করলে প্রত্যেকটি মানুষের জ্ঞানেই ধরা পড়বে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা একটা যুক্তিসঙ্গত নীতি অনুযায়ী রয়েছে। যে দেশকে আল্লাহ কৃষিসম্পদে ভরপুর করেছেন তাদেরকে

www.pathagar.com

খনিজসম্পদ দিয়েছে খুব কম, আবার যেসব দেশকে খনিজসম্পদের মাধ্যমে বলিষ্ঠ করেছেন তাদেরকে কৃষিসম্পদের ক্ষেত্রে করেছেন দুর্বল। এভাবে তার প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন যেন কোনো দেশ সকল ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হতে পারে এবং কোনো দেশ যেন প্রতিটি ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভরশীলও না হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ বলেন, وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ –'এবং তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে ভারস্যাম্য রক্ষা করেছেন।' যার ফলে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের লোকেই তাদের জীবিকা নির্বাহে সক্ষম। এসব কি কোনো সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন মহা পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনা ছাড়াই সম্ভব? তা কোনোদিনও সম্ভব নয়।

৩১ নং যুক্তি
পশুর মধ্যে খাদ্য বস্ত্র ও বিভিন্ন প্রকার উপকারিতা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ *

অর্থ ঃ এবং তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শীতবস্ত্র, বহু প্রকার উপকারিতা এবং এমন কিছু যা তোমরা খেয়ে থাকো। (সূরা আন-নাহল ঃ ৫)

এই আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ বলছেন–'তোমরা পশুদের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে সকালে বের হও এবং বিকেলে ফিরে আসো, এভাবে বিভিন্ন শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করো।'

আমরা দেখি সত্যিই পশুর পশম দিয়ে গরম কাপড় বা বস্ত্র তৈরি হয় যার গুরুত্ব আমরা ও আরবের মরুভূমির লোক টের না পেলেও যারা উত্তর বা দক্ষিণমেরুর কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসী তারা ভালোই টের পায় যে, পশুর পশম থেকে শীতবস্ত্রের উপকারিতা কত বেশি।

তাছাড়া مَنَافِعُ (মানাফীয়ু) শব্দ দ্বারা বিভিন্ন ধরনের উপকারিতার কথা বলা হয়েছে তা যে কি সেটা চিন্তা করলে সবার মগজেই ধরা পড়বে। তাহলো পশুর মল-মূত্রে সার, চামড়ার জুতা, ব্যাগ আরো কত ধরনের ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। এছাড়া পশুর হাড় থেকে সার ইত্যাদি অনেক কিছু আমরা পেয়ে থাকি।

www.pathagar.com

৩২ নং যুক্তি
পশুর পেটে দুধের কারখানা

আল্লাহ বলেন ঃ

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ *

অর্থ ঃ আমি এমনকিছু তোমাদের পান করাই যা তৈরি হয় পশুর পেটে তার মল-মূত্র ও রক্তের ভিতরকার কারখানা থেকে। যা পানকারীদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য। (সূরা আন-নাহল ঃ ৬৬)

এখানে আল্লাহ বলেছেন, পশুর মলমূত্র ও রক্তের মধ্যখান থেকে তৈরি হয় খাঁটি দুধ। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, পশু যা খায় তারই একাংশ মল-মূত্রে পরিণত হয়, আর একাংশ থেকে বেরিয়ে আসে দুধের যাবতীয় উপাদান এবং তা থেকে কত সুন্দর ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে তৈরি হচ্ছে দুধ যা স্তন বা বাট থেকে বেরিয়ে আসছে এক বৈজ্ঞানিক পন্থায়–যার মুখ সর্বদাই নিচের দিকে, কিন্তু তা ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে যায় না। তা পানকারীরা দোহন করে বের করে। এটাও কি কোনো দৈব দুর্ঘটনার ফলে হতে পারে?

৩৩ নং যুক্তি
মৌমাছির পেটে মধুর কারখানা

আল্লাহ মধু সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ * ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ

www.pathagar.com

مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ *

অর্থ ঃ এবং তোমাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন মৌমাছির প্রতি যে, তোমরা পাহাড়-পর্বতে ও গাছের ডালে এবং উচ্চশিখরে মৌচাক তৈরি করো। অতঃপর সব ধরনের ফল ও ফুলের রস ভক্ষণ করো। অতঃপর আল্লাহর চিরন্তন শাশ্বত পথগুলো অতিক্রম করো। এরপরই মৌমাছির পেট থেকে নানা রং-এর মধু বেরিয়ে আসে। যার মধ্যে মানবজাতির জন্য রয়েছে রোগ নিরাময়ের উপাদান। এসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে অবশ্য চিন্তাশীলদের বুঝার মতো বহু কিছু নিদর্শন রয়েছে।

(সূরা আন-নাহল ঃ ৬৮-৬৯)

চিন্তাশীলদের চিন্তায় এটা সহজেই ধরা পড়বে যে, মানুষের তৈরি কারখানায় কত হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে কোনো কিছু তৈরি করতে হয়। তা-ও অনেক সময় ফেল করে কিংবা ফ্রেশ মাল পাওয়া যায় না। কিন্তু আল্লাহর তৈরি কারখানায় একটি নয়া পয়সাও খরচ নেই, তা কোনোদিন ফেলও করে না এবং তাতে কোনো ভেজাল মালও তৈরি হয় না, তা হয় সম্পূর্ণ খাঁটি।

চিন্তা করুন মৌমাছির দ্বারা আল্লাহ যে কাজ করান তা কি মানুষ পারবে করতে? পারবে কি হাজারো চেষ্টা করে একটা মৌচাক তৈরি করতে? এবং পারবে কি ফুলের রস থেকে ফ্রেশ মধু তৈরি করতে যেমন আল্লাহ করেছেন? আর সে মধুর মধ্যে আল্লাহ রেখেছেন সর্বরোগের ওষুধ যা পরীক্ষিত সত্য। এটা কী করে সম্ভব? এর জবাব আল্লাহকে অস্বীকার করে দেয়া যাবে কি? তা কক্ষনো যাবে না।

৩৪ নং যুক্তি

গাছ থেকে জীবের খাদ্য ও জীব থেকে গাছের খাদ্য

আল্লাহর কি আশ্চর্য ব্যবস্থাপনা! জীব খেয়ে যে মলমূত্র ত্যাগ করে তার মধ্যে রয়েছে গাছের খাদ্য, আর গাছ যে ফল দেয় তা হয় মানুষের খাদ্য। মানুষ নিঃশ্বাস নিয়ে যে বায়ুকে দূষিত আকারে ছেড়ে দেয় গাছ তা নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করে ও পরে তা বিশুদ্ধ করে জীবের নিঃশ্বাস উপযোগী

www.pathagar.com

করে ছেড়ে দেয়। আবার জীব তা নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করে। এভাবেই গাছের সহায়তায় জীব ও জীবের সহায়তায় গাছ বেঁচে থাকে।

তাছাড়া আরো লক্ষণীয় যে, মানুষকে আল্লাহ হিকমত দিয়েছেন। তাদের খাদ্য যেসব গাছের মাধ্যমে আসে তা কষ্ট করে ও অনেক চেষ্টা-সাধনা করে জন্মাতে হয় যেমন বিভিন্ন দামি ফলের গাছ। কিন্তু পশুর খাদ্য যে ঘাস তা ধানের মতো করে ফলাতে হয় না, কারণ পশুকে আল্লাহ হিকমত দেননি। এসব ব্যবস্থাপনাও কি অ্যাক্সিডেন্টের ফল?

৩৫ নং যুক্তি
বিভিন্ন প্রকার গাছে টিকে থাকার ব্যবস্থা

দেখুন গুড়িওয়ালা গাছগুলো শক্ত মজবুত শিকড় গেড়ে মাটির উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন ছোট-খাট ধাক্কায় ও বাতাসের ঝাপটায় উপড়ে না যায়। পক্ষান্তরে যেগুলো লতা জাতীয় গাছ, ঝড়ের ঝাপটা সইতে পারে না তাদেরকে আল্লাহ এমন শক্তি দিয়েছেন যে, কোনো কোনো লতা গাছ বেয়ে উপরে ওঠে ও নরম অগ্রভাগটা বৃত্তাকারে ঘুরাতে ঘুরাতে লম্বা হয়। সেই লতার যখন-ই কোনো শক্ত কিছুর সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যায় তখন তাকে পেঁচানো শুরু করে। এভাবে পেঁচাতে পেঁচাতে উপরে ওঠে যেন মোটা শক্ত কিছুকে অবলম্বন করে তারা টিকতে পারে

আর কিছু লতা গাছ আছে যাদের পাতার বোটার গোড়া দিয়ে সরু 'তার' বের হয় এবং তারগুলো ক্রমেক্রমে লম্বা হয় ও বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠে। যখন-ই কোনো কিছুর সঙ্গে ছোঁয়া লেগে যায় তখন-ই ঐ তার দ্বারা তাকে পেঁচাতে শুরু করে। এভাবে লতা গাছগুলো বাঁচার একটা অবলম্বন করে নেয়। এর পিছনে কি কোনো ব্যবস্থাপক নেই?

৩৬ নং যুক্তি
ছোট প্রাণীর বাঁচার ও টিকে থাকার ব্যবস্থা

দেখুন ছোট এবং সর্বাপেক্ষা অসহায় প্রাণী উই পোকাকে আল্লাহ চোখ দেননি অথচ এমন হিকমত দান করেছেন যে, তাদের মতো করে অত সুন্দর কায়দায় কোনো জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ারও একটা ঘর তৈরি করতে পারবে না। আর যেহেতু তারা দেখে-শুনে খেতে পারে না তাই তাদের

www.pathagar.com

খাদ্য করেছেন আল্লাহ শক্ত কাঠ। তাদের দেহ সর্বাধিক নরম হওয়া সত্ত্বেও তাদের খাদ্য সর্বাদিক শক্ত জিনিস। আর যাদের জন্ম যেখানে যে পরিবেশে আল্লাহ তাকে সেখানেই সেই পরিবেশে বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন। আপনি কোনো মিষ্টি দ্রব্য আপনার বাড়ির যেকোনো লোকের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে রাখতে পারবেন, কিন্তু পারবেন কি তা পিঁপড়ার নাক এড়িয়ে লুকিয়ে রাখতে? এসব কি এমনিতেই হয়?

আমরা চিন্তা করলে আরো দেখতে পাবো, আল্লাহ যত ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকার ব্যবস্থাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। যেমন দেখুন, পানিতে যে মাছ বাস করে সে মাছের বাঁচার ব্যবস্থা কেমন সুনিপুণ অবস্থায় সৃষ্টি করে রেখেছেন। যারা যেখানে বাস করে সেখানেই তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। পানির মাছ পানির মধ্যেই তাদের খাদ্য পায় এবং আল্লাহ তাদের জন্য সেইসব খাদ্যই নির্ধারিত করেছেন যা পানিতে পাওয়া যাবে অর্থাৎ পানিতেই তাদের খাদ্য দেয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন।

আমরা নাকের সাহায্যে বায়ু থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি মাছেরা তাদের ফুলকা বা কানকোর সাহায্যে পানি থেকে সেই অক্সিজেনই গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। মাছের কানের কাছে যে ফুলকা থাকে যাকে মাছের ফলকাও বলে তাতে যে ঝাঝরার মতো থাকে ঐগুলোতে এমন শক্তি রয়েছে, যে শক্তি পানি থেকে অক্সিজেন নিতে সক্ষম।

এছাড়া দেখুন আমরা পৌষ মাসে ৩০ মিনিট পানিতে থাকলে সর্দি লেগে যাবে কিংবা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকবে। অথচ সেই ঠাণ্ডা পানিতেই পানির প্রাণীরা গোটা শীতের মৌসুম ধরে বাস করে, কিন্তু তাদের কিছুই হয় না। কেন হয় না? এসব কি কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হতে পারে?

এছাড়া আরো কত প্রাণী যে কত জায়গায় আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন আমরা কতটুকু তার খবর রাখি। এমনও প্রাণী আছে যাদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না, তাদেরও বাঁচার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। তাছাড়া দেখুন আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর ব্যবস্থাপনা কত বিজ্ঞোচিত। কুনো ব্যাঙ, যেগুলো ঘরে বাস করে তাদের গায়ের রং মাটির রঙের মতো, যেন তাদের শত্রুদের চোখে সহজে ধরা না পড়ে। আবার গেছো ব্যাঙ, যেগুলো গাছে

www.pathagar.com

বাস করে তাদের গায়ের রং গাছের রঙের মতো, যেন হঠাৎ কারো চোখে না পড়ে।

ঠিক তেমনি যে সাপ গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায় তাদের রং গাছের পাতার রঙের মতো ঐ একই রঙের। পাখিদের বেলায়ও ঐ একই ব্যবস্থা যেন হঠাৎ করে কারো চোখে ধরা না পড়ে। এছাড়া গরুর শিং, কুকুর-বিড়ালের নখর, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ ইত্যাদি তাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র তাদের সঙ্গেই জন্ম লাভ করে এবং তাদের দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েই থাকে। মানুষ যদি জ্ঞানবুদ্ধিবলে অস্ত্র তৈরি করতে না পারতো তবে মানুষকে আল্লাহ প্রাকৃতিক অস্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করতেন। কিন্তু যেহেতু মানুষকে আল্লাহ বুদ্ধি দিয়েছেন তাই বুদ্ধির দ্বারা যা তারা তৈরি করে নিতে পারবে তা আল্লাহ দেহের সঙ্গে জুড়ে দেননি।

এভাবে অন্যান্য প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবো আল্লাহর ব্যবস্থা কত মহাবিজ্ঞোচিত। চোখ নেই যে উই পোকার, তার মতো ঘর বানানোর কোনো যোগ্যতা আছে কি বিজ্ঞানীদের? কোনো বিজ্ঞানী পারবে তালের পাতা চিরে বাবুই পাখির মতো একটা বাসা বানাতে? পারবে কি মানুষ মাকড়সার মতো জাল বুনতে? পারবে কি মানুষ টুনটুনি পাখির মতো ডুমুরের পাতায় বাসা বানাতে? পারবে কি মানুষ পিঁপড়ার মতো তার দেহের ১৬ গুণ বেশি ভারি কোনো জিনিসকে দাঁত দিয়ে কামড়ে তুলে নিয়ে যেতে?

মুরগীর বাচ্চাদেরকে মুরগী এক বিশেষ ধরনের আওয়াজের মাধ্যমে যখন বিপদ সংকেত দেয় তখন বাচ্চাগুলো হুড়মুড় করে ঝোপ-ঝাড় কিংবা খড়-বিচালির নিচে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। আবার যখন-ই বিপদমুক্ত সংকেত দেয় তখন-ই বাচ্চাগুলো বেরিয়ে চলে আসে। এর জন্য তাদের তো কোনো ট্রেনিং দেয়া হয়নি। তবে তারা আত্মরক্ষার এ কৌশল শিখলো কার কাছ থেকে?

চিন্তা করলে এমন হাজারো ব্যবস্থাপনা মানুষের মাথায় ধরা পড়বে যা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি প্রাণীকুলের প্রতি কত মেহেরবান। এসব বিষয়কে সামনে রেখে চিন্তা করলে কি কোনো বদ্ধপাগলও বলবে যে, কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এমনিতেই এ বিশাল পৃথিবীসহ সবকিছু সৃষ্টি হতে পারে?

www.pathagar.com

৩৭ নং যুক্তি

গাছের প্রজনন

এমন অনেক গাছ রয়েছে যাদের ফুলের পুংকেশর থেকে পরাগরেণু গর্ভকেশর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য একধরনের পতঙ্গ আল্লাহ নিয়োগ করে রেখেছেন, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ুর দ্বারাই আল্লাহ এ কাজ সম্পন্ন করান, যা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন। এসব কি কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ফল?

৩৮ নং যুক্তি

মানব সন্তান কেন অসহায়

আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তারা (মানুষ) ছিল জালিম ও জাহেল।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

অর্থ ঃ মানব জাতিকে খুব দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

দেখা যায়, যে মানবজাতি চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সেই মানবসন্তানেরই এমন একদিন ছিল যেদিন সে নিজের পায়খানা নিজেই নিজ হাতে তুলে মুখে দিতো। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন সে ছিল জালিম ও জাহেল। একটা মুরগীর বাচ্চা এমন কিছুই খায় না যা তার জন্য অখাদ্য। তাছাড়া ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েই তারা ততটুকু হুঁশিয়ার যতটুকু হুঁশিয়ার পূর্ণ বয়স্ক মুরগীরা। দেখুন তারা একেবারেই শিশুকালে মায়ের মুখের কোনো বিপদ সংকেত শুনে সঙ্গে সঙ্গে কোনো নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে পড়ে এবং মায়ের মুখ থেকে বিপদমুক্ত সাইরেন শোনার পর বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোনো মানবসন্তাই শিশুকালে এমনটি পারে না। পারে না বলেই আল্লাহ তাদের বলেছেন جَاهِلٌ বা অজ্ঞ ও ضَعِيف বা দুর্বল।

www.pathagar.com

কিন্তু কেন এদের আল্লাহ ছোটকালে এতদূর জাহেল ও জয়ীফ বা অজ্ঞ ও দুর্বল করে সৃষ্টি করলেন? করলেন এজন্য যে, মানবসন্তান যখন পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনসহ বহু ব্যক্তির স্নেহ-মমতা ও সাহায্য-সহানুভূতি পেয়ে বড় হতে থাকে তখন তার মধ্যে সৃষ্টি হয় তার সাহায্যকারীদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব, যা পরবর্তীকালে তাকে একটা সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলে এবং এরই থেকে সৃষ্টি হয় সামাজিক দায়িত্ববোধ। মানবসন্তান যদি ভেড়া-বকরির মতো জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের খাদ্য নিজেই খুঁজে নিয়ে খাওয়া শিখতো তবে অবশ্যই সে দায়িত্ববোধসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারতো না।

মানবসন্তানকে এভাবে অসহায় করে সৃষ্টি করার পিছনে আল্লাহর যে বিরাট হিকমত রয়েছে তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? কেউ তা পারবে না।

এভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ দেখতে পাবে এ বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্বের ও তাঁর পরম করুণার নিদর্শন–যা কখনো লিখে বা বলে শেষ করা যাবে না। তাই আল্লাহ যথার্থ বলেছেন ঃ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا *

অর্থ ঃ আল্লাহর দান বা নিয়ামত তোমরা কখনোই গুণে শেষ করতে পারবে না।

সুতরাং আমাদের দ্বারা তা পারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবে এখানে যতটুকু বলা হলো তা শুধুমাত্র চিন্তার একটা সূত্র বের করে দেয়ার জন্য। এবার এই সূত্র ধরে আপনি যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করবেন ততই আপনার মগজে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ও তার অপরিসীম করুণার কথা ধরা পড়বে।

৩৯ নং যুক্তি

জীবন ধারণের প্রধান উপাদান কোনো সম্পদ নয়

দেখুন, জীবন্ত প্রতিটি প্রাণীকে এমনকি গাছ-পালাকেও বাঁচতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে–যার জন্য প্রয়োজন বায়ু এবং বায়ুতে পরিমিত পরিমাণ সেইসব গ্যাসীয় পদার্থ থাকা যা প্রাণীর বাঁচার জন্য প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আর শ্বাস যেহেতু সর্বক্ষণই প্রয়োজন তাই এর উপাদানসমূহ আল্লাহ এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন যে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। তাই তা কাউকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। যদি তা পয়সা দিয়ে কিনতে হতো তাহলে কোনো প্রাণীরই আজ কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না।

তদ্রূপ পানিও জীবন ধারণের জন্য এমন প্রয়োজনীয় যে, পানি ছাড়া কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। শুধু যে বাঁচতে পারে না তাই নয় বরং কোনো প্রাণী পানি ছাড়া অস্তিত্বই লাভ করতে পারে না–সে পানিও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি রয়েছে। কিন্তু বায়ুর তুলনায় পানির প্রয়োজন যে পরিমাণে কম বায়ুর তুলনায় পানির পরিমাণও ঠিক সেই একই হারে কম। সুতরাং পানি কোনো কোনো এলাকার সম্পদ অর্থাৎ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। কিন্তু তা এমন নয় যা সেই এলাকার অধিবাসীদের জন্য দুর্লভ।

এছাড়াও লক্ষণীয় যে, শ্বাস নেয়ার জন্য কোনো ঐচ্ছিক চেষ্টার প্রয়োজন নেই। তা সারাজীবনই জ্ঞানের অগোচরে নাক দিয়ে শ্বাস যাচ্ছেই এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ সেরে সে বেরিয়ে আসছেই। এটাও কি বিনা পরিকল্পনায় হতে পারে? তা অবশ্যই পারে না।

৪০ নং যুক্তি

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই আল্লাহবিশ্বাসের অনুকূলে

আল্লাহ যেমন মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন তেমনি তার বিবেককে আল্লাহবিশ্বাসের অনুকূল স্বভাবের করে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, সে যেকোনো বড় নাস্তিকই হোক না কেন, সে যখনই কোনো বড় ধরনের বিপদে পড়ে তখন তার জ্ঞানের অগোচরেই সে আল্লাহকে স্মরণ করা শুরু করে। এবং এটাও প্রমাণিত সত্য যে, পৃথিবীর বড় বড় নাস্তিকদেরও মৃত্যুর পর তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাদের জন্মগত ধর্মীয় বিধান অনুসারেই সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন ডারউইন, কার্লমার্কস, লেনিন এরা যেহেতু জন্মগতভাবে ইহুদী ছিলেন তাই ইহুদী ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আর মাও সেতুং যেহেতু জাতে বৌদ্ধ ছিলেন তাই তার শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বৌদ্ধধর্মের নিয়ম অনুযায়ীই সম্পন্ন হয়েছিল।

www.pathagar.com

এছাড়াও দেখা যায় যা-ই আল্লাহর বিধান তা-ই মনেরও বিধান। যেমন আল্লাহ বলেছেন 'সত্য কথা' বলতে তাই মনকেও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন 'সত্য' বলারই অনুকূলে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান মেনে চলাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ শুধুমাত্র লোভ-লালসার বশবর্তী হয়েই আল্লাহর বিধান অমান্য করে। যেমন ছোট্ট শিশুরা–যারা এখনো লোভ বোঝে না তারা কখনোই মিথ্যা বলবে না এবং যারা বদ্ধপাগল তারাও মিথ্যা বলবে না, কারণ তাদের লোভ-লালসার অনুভূতি থাকে না।

আল্লাহ যেহেতু সত্য বলাই পছন্দ করেন তাই তিনি মানুষের প্রবৃত্তিকে সত্যবাদী স্বভাবের করেই সৃষ্টি করেছেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা যায় আল্লাহ মানুষের মনকে আল্লাহ ও তাঁর বিধান মানার উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন যাকে বলতে হবে আল্লাহ্‌র পূর্ব পরিকল্পিত সৃষ্টি।

৪১ নং যুক্তি
আল্লাহর সূক্ষ্ম হিসাব

সম্প্রতি বাংলাদেশের বাজারে 'সত্যের সন্ধান' নামে একখানা বই বেরিয়েছে। তাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে অংক না জানার অভিযোগ করা হয়েছে। এখানে সে অভিযোগের একটা সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হলো।

যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি ফারায়েজের একটা অংকের কথা তুলে ধরেছেন। সূরা আন-নিসার ১১ নং আয়াতের এক অংশে বলা হয়েছে ঃ

যদি কারো মৃত্যুর পর ২ মেয়ে থাকে আর মা ও বাবা বেঁচে থাকে তাহলে পিতা-মাতা উভয়ে পাবেন $\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{২}{৬}$ বা $\frac{১}{৩}$ অংশ আর ২ মেয়ে পাবে $\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{২}{৩}$ অংশ, এভাবে $\frac{১}{৩}+\frac{২}{৩}=১$ অর্থাৎ পুরা অংশ। কিন্তু যদি তার স্ত্রী থাকে তবে সেই স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ। এই $\frac{১}{৮}$ অংশ সে পাবে কোথা থেকে?

উক্ত প্রশ্ন তুলে তিনি মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ কি তাহলে অংকে অনভিজ্ঞ! তার মন্তব্যে মনে হয় যেন তিনি আল্লাহর একটা অংকের ভুল ধরিয়ে দিয়ে মনে মনে খুবই উৎফুল্ল। এখানে ফারায়েজের ব্যাপারটা একটু পরে আলোচনা করবো। তার পূর্বে খানিকটা যাচাই করে দেখি যে, আল্লাহ

www.pathagar.com

কি বিংশ শতাব্দীর উচ্চতর অংকের যুগের কিছু কিছু অংকে সত্যিই অনভিজ্ঞ কি না। আর এটাও দেখি যে, তিনি কি কি অংক জানেন।

অনেকে বলেন সাধারণের কথার জবাব দেয়া ঠিক নয়। এর সাথে আমিও একমত, তবে যেসব কথায় কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং জাহান্নামের রাস্তা ধরে, তাদেরকে ফেরানোর জন্য কিছু কথা বলা উচিত মনে করে নিম্নে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচন পেশ করছি।

আল্লাহর জানা অংকগুলোর কয়েকটি

আসমান ও জমিন কিছুই যখন সৃষ্টি হয়নি এবং যখন তিনি সৃষ্টিতে হাত দিলেন তখন প্রথম যা সৃষ্টি করলেন তাহলো وَهِيَ دُخَانٌ অর্থাৎ 'তা ছিল (বাষ্পীয়) ধোঁয়ার কুণ্ডলী।' (সূরা হামীম আস-সাজদা ঃ ১১)

এরপর আল্লাহ হুকুম করলেন ঃ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا *

অর্থ ঃ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আসমান ও জমিন অস্তিত্ব ধারণ করো।

তখন আসমান ও জমিনের পক্ষ থেকে জবাব এলো ঃ

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ *

অর্থ ঃ আমরা অনুগতদের মতোই অস্তিত্ব ধারণ করলাম।

এর থেকে কয়েকটা জিনিস বুঝা গেল, যথা ঃ

১. সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা কত বড় বা কি আয়তনের হওয়ার প্রয়োজন ছিল সে হিসাব তাঁর নির্ভুলভাবে জানা ছিল।

২. আসমান এবং জমিনের কোনটার আয়তন কতটুকু হওয়া উচিত এবং একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব কতটুকু হতে হবে সে হিসাব আল্লাহর সঠিকভাবেই জানা ছিল।

৩. কেন এক মূল বস্তু থেকে সবকিছুর সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন এ হিসাবও তাঁর নির্ভুলভাবে জানা ছিল।

www.pathagar.com

৪. সাত আকাশকে কত দূরে দূরে রাখলে বিজ্ঞানসম্মত হবে সে অংকও আল্লাহ নির্ভুলভাবে জানতেন।

৫. কতগুলো 'নক্ষত্র' নামের সূর্য থাকতে হবে, কতগুলো গ্রহ থাকতে হবে, কোন গ্রহের কতগুলো উপগ্রহ থাকতে হবে, তার কোনটার দূরত্ব কোনটা থেকে কত দূরে হবে যেন একটার সঙ্গে আরেকটার টক্কর না লাগে, সে অংক আল্লাহর অত্যন্ত নিখুঁতভাবে জানা আছে।

৬. একটা নক্ষত্র থেকে অন্য আরেকটা নক্ষত্রের দূরত্ব কতটা হতে হবে এবং কোনটার আয়তন কতটা হতে হবে সে হিসাবে আল্লাহর বিন্দুমাত্রও গরমিল নেই।

৭. প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্র মহাশূন্যের মধ্যে গতিশীল অবস্থায় রয়েছে এবং রয়েছে সুনির্দিষ্ট গতিবেগ, আর রয়েছে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সূর্য ইত্যাদি প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট চলার পথ। আপন আপন পথ থেকে এদের কোনোটি যদি একবিন্দু পরিমাণও সরে যেত তাহলে একটার সঙ্গে অন্যটার টক্কর লেগে কবে এ সৃষ্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। এসবের যদি হিসাব মানুষের তৈরি স্কাইল্যাবের মতো হতো তাহলে উপায়টা কি হতো? অথচ কোটি কোটি বছরের মধ্যে ঘটলো না এর কোনো ব্যতিক্রম। এ হিসাব যিনি জানেন তিনিই কি অংকে অনভিজ্ঞ?

৮. পৃথিবী সূর্যের চার পাশের প্রায় ৬২ কোটি মাইলের বৃত্তাকার পথ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় যে একবার ঘুরে আসে, এ পথের মাপ ও চলার গতির মধ্যে রয়েছে এমন নিখুঁত হিসাব যে, তার মধ্যে কোনো ধরনের সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটলে কমপক্ষে ৩টি বিপর্যয়ের যেকোনো একটি ঘটতো। যথা ঃ

ক) পৃথিবীর সঙ্গে অন্য যেকোনো গ্রহের টক্কর লাগতো। নইলে–

খ) পৃথিবী কবে সূর্যের মধ্যে ঢুকে পড়তো। কিংবা

গ) পৃথিবী সূর্য থেকে এত দূরে সরে যেত যে, সূর্যকে একটা নক্ষত্রের মতো দেখা যেত। ফলে পৃথিবীর তাপ হারিয়ে বরফের একটি পিণ্ডে পরিণত হতো। তাতে একটি প্রাণীও বাঁচতে পারতো না। অর্থাৎ কলের গানের রেকর্ড যেমন কেন্দ্রের চারপাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয় ঠিক তেমনি পৃথিবী যদি ঘুরতে ঘুরতে এক বিন্দু করে কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ সূর্যের দিকে

www.pathagar.com

এগোত তাহলে এতদিনে হয়ত পৃথিবী সূর্যের মধ্যে ঢুকে পড়তো। আর যদি পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে এক বিন্দু করে দূরে সরে যেত তাহলে পৃথিবী কবে বরফে ঢাকা পড়ে যেত। কিন্তু কৈ, তা তো হচ্ছে না? এই জন্যই তো আল্লাহ বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ *

অর্থ ঃ এ সবকিছু নির্ধারণ করেছেন তিনি যিনি মহাশক্তিধর ও মহাজ্ঞানী। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮)

আর এ হিসাবে কোনো ব্যতিক্রম হবে না বলেই তিনি বলেছেন ঃ

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا *

অর্থ ঃ তোমরা কখনোই আল্লাহর সুনির্ধারিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনোরকম পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম পাবে না। (সূরা ফাতির ঃ ৪৩)

যা প্রকৃতপক্ষেই আমরা পাচ্ছি না।

৯. মহাশূন্যের মধ্যে গতিশীল সবকিছুতেই একটা সুনির্ধারিত আয়তন আছে এবং কি পরিমাণ আয়তন ও ঘনফলবিশিষ্ট কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রের কোনটার মধ্যে যে কি পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিলে সে মহাশূন্যে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে সে হিসাবে বিন্দুমাত্রও যদি ব্যতিক্রম কোনোদিন ঘটতো তাহলে কবে এ সৃষ্টি বিলয় হয়ে যেত। কিন্তু তাতে কোনো ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

১০. আল্লাহর এ হিসাবেও কোনো গরমিল নেই যে পৃথিবীর কোন জিনিসের কি পরিমাণ আয়তনের কোন জিনিসের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণ কি পরিমাণ হতে হবে অর্থাৎ যে আয়তনের লোহার ওজন এক মণ হবে সেই আয়তনের পারদের ওজন কত হতে হবে। আর অন্যান্য ধাতব পদার্থের কোনটা কি পরিমাণ ঘনত্বের কারণে কি পরিমাণ ভারি হতে হবে তার হিসাবে কিছুমাত্র রদবদল নেই। যদি থাকতো তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হলে ট্রেন জোরে চলতে গেলে ছিটকে পড়ে যেত।

www.pathagar.com

আর যদি আকর্ষণের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেত তাহলে প্লেনগুলো উড়তে পারতো না। তাঁর এসব অংকের হিসাব এত নিখুঁত যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ খুব ছোট্ট করে বলেছেন সূর্য ও চাঁদের দূরত্বের একটা হিসাবের কথা। বলেছেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

অর্থ ঃ সূর্য ও চাঁদের জন্য রয়েছে দুই ধরনের হিসাব।

চাঁদকে এমন দূরে রাখা হয়েছে যেন নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হতে পারে। অর্থাৎ চাঁদ যদি আরো নিকটে হতো তাহলে জোয়ারের পানিতে কবে পৃথিবীর প্রাণীকুল ডুবে শেষ হয়ে যেতো। আর যদি চাঁদ আরো দূরে থাকতো তাহলে জোয়ার-ভাটা হতেই পারতো না।

বাংলায় যাকে বলা হয় 'অংক' আরবীতে তাকেই বলে 'হিসাব'। এই 'হিসাব'-এর দ্বিবচন হচ্ছে আরবীতে 'হুসবান'।

'হুসবান' বা অংকের কথাই আল্লাহ বলছেন–'এ অংক আমার নিখুঁতভাবে জানা আছে এবং সে অনুযায়ী চাঁদ ও সূর্যকে পৃথক পৃথক হিসাব অনুযায়ী একটা বিজ্ঞানসম্মত দূরত্বে রাখা হয়েছে।'

সূর্যের হিসাব হচ্ছে এই যে, তার দূরত্ব বছরের সবসময় এক ধরনের নয়। যখন সূর্য বিষুবরেখার উত্তরে থেকে পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন সূর্য পৃথিবীর থেকে পৌষ মাসের তুলনায় ৩০ লক্ষ মাইল বেশি দূরে থাকে। কারণ সরাসরি সূর্যের কিরণে যে পরিমাণ মাটি যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় সেই পরিমাণ পানি ততশীঘ্র উত্তপ্ত হয় না। তাই পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চলের বেশির ভাগ পানির উপর যখন সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন যেহেতু দক্ষিণ অঞ্চলে পানির ভাগ বেশি তাই তখন সূর্য আষাঢ় মাসের তুলনায় ৩০ লক্ষ মাইল নিকটে এসে যায়। এ হিসাব এত সূক্ষ্ম যা হয়ত জনাব আরজ আলী সাহেবের বন্ধু-বান্ধবগণ অংক কষে মিলাতে পারবে না।

১১. মানুষের দেহের মধ্যকার যেকোনো অঙ্গ বা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহর হিসাব কত নিখুঁত। যেমন রক্তকণিকার মধ্যে

www.pathagar.com

কি কি উপাদান কোনটা কত ভাগ থাকলে মানুষের দেহটা সুস্থ থাকবে সে হিসাব আল্লাহর নিখুঁতভাবে জানা আছে এবং তা সেই পরিমাণ শুধু মানুষের দেহেই নয়, সব ধরনের প্রাণীর মধ্যেই তা রয়েছে। ঠিক তেমনি একটা মানুষ মাথা উপর দিকে রেখে চলাফেরা করার জন্য রক্তের সঞ্চালন পদ্ধতিটা কেমন হতে হবে, যেন মানুষ মাথায় রক্ত উঠে মরে না যায় তা হিসাবমতোই নিয়ন্ত্রণ করেছেন আল্লাহ। ফলে আমরা মাথা উপরের দিকে রেখে চলা-ফিরা করতে পারি। কিন্তু পারি না পা উপরের দিকে দিয়ে হাঁটতে। কেন পারি না? পারি না এজন্য যে, আল্লাহর সাজানোটাই এমন যে, মাথা উপরে দিয়ে এবং পা নিচের দিকে রেখেই মানুষ যেন চলতে পারে। এসব হিসাব আল্লাহ ঠিকই জানেন।

১২. আল্লাহ খুবই নিখুঁত হিসাব রাখেন আমরা যা খাই তার প্রতি। কোনটা কোন উপাদানের সংস্পর্শে কিভাবে হজম হবে তার কোন অংশটা শরীরের কোন জায়গায় কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে কিভাবে মিলিত হবে, কিভাবে দেহের শক্তি যোগাবে আর কোন অংশটা প্রস্রাব হবে, কোন অংশটা পায়খানা হবে, কিভাবে দেহের ক্ষয় হবে ও কিভাবে তা পূরণ হবে, এসব হিসাব আল্লাহ নিখুঁতভাবে জানেন।

তিনি জানেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেনটা দেহের মধ্যে কোথায় যাবে। দেহের কোন অঙ্গ তাকে গ্রহণ করবে এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেহের কোন কোন অংশে পৌছা দরকার এবং তা কেমনভাবে পৌঁছাতে হবে। এসব হিসাব আল্লাহ কম জানলে পৃথিবীর প্রাণীকুল কি অনেক পূর্বেই শেষ হয়ে যেত না?

আল্লাহর অংক জানার খবর আমার যেটুকু জানা আছে তারচেয়ে অনেক বেশি জানা আছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীদের। আমার মাথায় যা ধরা পড়ে তা তাদের চেয়ে অনেক অনেক কম। তবু যা আমার জ্ঞানে ধরা পড়ে তা লিখলে গ্রন্থ অনেক বড় হয়ে যাবে। আর এটা এমন যুগ নয় যে, মানুষ অল্পে বোঝে না। সুতরাং বেশি লেখার প্রয়োজন মনে করি না। সংক্ষেপে উক্ত ফারায়েজের তাৎপর্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

www.pathagar.com

আমরা মূলনীতিশাস্ত্র বা উসূল থেকেই জানি যে, ইসলামের মধ্যে যেকোনো বিতর্কিত প্রশ্নের উত্থান হলে বা কোনো সমস্যা দেখা দিলে আল-কুরআন থেকে তার সমাধান মিলবে। এটা প্রথম দলিল।

আর যদি কুরআন থেকে সুস্পষ্ট কোনো সমাধান না পাওয়া যায় তাহলে হাদীস থেকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এটা ইসলামের দ্বিতীয় দলিল।

আর তাতেও যদি সমস্যার সঠিক সমাধান না পাওয়া যায় তাহলে কুরআন-হাদীসের মূলনীতির ভিত্তিতে ওলামায়ে দ্বীনের 'ইজমা' থেকে তার সমাধান নিতে হবে। এটা তৃতীয় দলিল এবং তাতেও যদি সমাধান না হয় তাহলে কুরআন-হাদীসের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে 'কিয়াস' করতে হবে। এটা হচ্ছে ইসলামের চতুর্থ দলিল। কিন্তু মূল দলিল হচ্ছে কুরআন। তাই পরবর্তী বিষয়গুলো মূল দলিলের বিরোধী হতে পারবে না। এটাই ইসলামের মূলনীতি।

আর এ ধরনের কিছু ব্যাপার আল্লাহ মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছেন যেন আমরা গবেষণা করার সুযোগ পাই এবং এর মাধ্যমে যেন আমাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটতে পারে। আল্লাহ যে মানুষকে চিন্তা করে সত্য আবিষ্কারের সুযোগ দিয়েছেন সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হযরত আলী (রা) এ মাসয়ালার সমাধান দিয়েছেন এইরকম ঃ

পিতা $\frac{১}{৬}$ + মাতা $\frac{১}{৬}$ + ২ মেয়ে $\frac{২}{৩}$ + স্ত্রী $\frac{১}{৮}$

$\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} + ২\frac{২}{৩} + \frac{১}{৮}$ = এর লঃ সাঃ গুঃ ২৪

অতএব = $\frac{৪}{২৪} + \frac{৪}{২৪} + \frac{১৬}{২৪} + \frac{৩}{২৪} = \frac{১২}{২৪}$

অথবা, আরো সহজ করে লিখলে–

পিতা	ঃ	$\frac{৪}{২৪}$
মাতা	ঃ	$\frac{৪}{২৪}$
২ মেয়ে	ঃ	$\frac{১৬}{২৪}$
স্ত্রী	ঃ	$\frac{৩}{২৪}$
সর্বমোট	ঃ	$\frac{২৭}{২৪}$

www.pathagar.com

এতে মূল অপেক্ষা $\frac{৩}{২৪}$ বৃদ্ধি হয়ে যায়। এ কারণে মোট সম্পত্তিকে ২৭ ভাগ করে–

৪ ভাগ পিতা

৪ ভাগ মাতা

১৬ ভাগ ২ মেয়ে

৩ ভাগ স্ত্রী

মোট ঃ ২৭ ভাগ

অতএব, মোট ২৭ ভাগ করে এর সমাধান দেয়া হয়েছে। এ ধরনের অবস্থায় নির্দেশই রয়েছে যে, যেখানেই এই ধরনের কোনো কিছু ঘটবে সেইখানেই– * فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ

অর্থ ঃ তোমরা ইনসাফ অনুযায়ী ফয়সালা করে দাও।

এভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে অনেক কিছুরই ফয়সালা করার অধিকার আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। দিয়েছেন বিচারের ক্ষেত্রেও। সেখানে মাত্র ৫টি অপরাধ ছাড়া সব অপরাধের বিচারের স্বাধীনতা বিচারকের রয়েছে। সেই পাঁচটি অপরাধ হলো ঃ

১. চুরি, ২. ডাকাতি, ৩. জেনা, ৪. জেনার অপবাদ ও ৫. মদ্যপান। এই অপরাধগুলোর শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত, আর বাকি অপরাধের শাস্তির বিচার করার অধিকার আল্লাহ বিচারককে দিয়েছেন।

এছাড়া ফারায়েজের ব্যাপারে আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে এই যে, ওয়ারিস যত বাড়বে তার ভাগের পরিমাণ তত কমবে।

অতএব এখানে ওয়ারিস একজন বেড়েছে, সুতরাং অন্যের ভাগে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সম্পত্তির পরিমাণ কমেছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামই একমাত্র ধর্ম

ধর্মীয় ব্যাপারে আমার চিন্তাধারা

আমি চিন্তা করি, কারো সামনে কেউ যদি এন্ড্রিনকে ওষুধ মনে করে রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশায় পান করতে যায় তবে তাকে সেই এন্ড্রিন পান করা থেকে বিরত রাখা যেমন এন্ড্রিনকে 'বিষ' বলে জানা লোকদের জন্য একটা বিরাট নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি বরং তারচেয়েও অনেক গুণ বেশি দায়িত্ব এসে পড়ে তাদের উপর যারা স্পষ্টভাবে বোঝেন যে, কিছু লোক ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণে পরকালের মুক্তির আশায় ভুল করে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদেরকে ঐ আগুনের পথ থেকে ফেরানো আল্লাহবিশ্বাসীদের জন্য একটা অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব।

এটা যে কতবড় দায়িত্ব তা মানুষ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতো যদি মৃত্যুর পরের ঘটনাগুলোকে আল্লাহ এই জীবনে দেখার ব্যবস্থা করে দিতেন। কিন্তু যদিও আল্লাহ চর্মচক্ষে তা দেখার কোনো ব্যবস্থা করেননি, তবু জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তা দেখার ব্যবস্থা করেছেন। জ্ঞানের চোখ দিয়ে তা কিছু লোক দেখেও থাকেন।

আমি চিন্তা করি, একটা লোককে আগুনে পুড়তে দেখেও যারা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে না তারা যেমন চরম নিষ্ঠুর, নির্দয় ও পাষণ্ড ঠিক তেমনি চরম নিষ্ঠুর ও নির্দয় হিসেবে আমি নিজেই আল্লাহর দরবারে চিহ্নিত হবো যদি আমি আমার জ্ঞানচক্ষুতে স্পষ্টভাবে কিছু লোককে আগুনের দিকে ছুটে যেতে দেখেও তাদেরকে সেই আগুনের পথ থেকে ফেরানোর জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা না করি। এই অনুভূতিই আমাকে বহুদিন থেকে পীড়া দিচ্ছিল। তাই আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আমার জ্ঞান অনুযায়ী কিছু যুক্তি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

www.pathagar.com

সব ধর্মই কি ঠিক

যারাই কোনো না কোনো ধর্ম মানে তারা প্রত্যেকেই মনে করে, ধর্ম আমারটাই ঠিক, অন্যদেরটা ভুল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, একই বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের বিপরীতমুখী দাবির সবগুলোই কি ঠিক হতে পারে? একই অংকের একাধিক উত্তরের সবগুলোই যেমন ঠিক হতে পারে না তেমনি একই সৃষ্টিকর্তার দেয়া 'ধর্ম' সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধরনের বিপরীতমুখী দাবি বা ধারণার সবগুলোই ঠিক হতে পারে না, এটাই যুক্তি।

এখন প্রশ্ন, দাবি কারটা ঠিক এবং কারটা বে-ঠিক? এ প্রশ্নের অবশ্যই সঠিক জবাব আছে। তবে তা বুঝতে হলে কমপক্ষে নিচের শর্তগুলো মেনে নিতে হবে। এর জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে মনকে নিরপেক্ষ ও গোঁড়ামীমুক্ত করতে হবে এবং কোন ধর্ম ঠিক তা বুঝতে হলে বুঝার পূর্বে নিজেকে ধরে নিতে হবে যে, আমি কোনো ধর্মেরই লোক নই। আমার সামনে অনেকগুলো ধর্ম রয়েছে। এগুলো আমি দেখি, সত্য-মিথ্যা যাচাই করি, এরপর যেটা সঠিক বলে আমার জ্ঞানে সায় দিবে সেটাই আমি গ্রহণ করবো। এর জন্য আরো যা প্রয়োজন হবে তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. যুক্তি মানতে রাজি থাকতে হবে অর্থাৎ সত্যকে 'সত্য' ও মিথ্যাকে 'মিথ্যা' বলে মানতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২. মানতে হবে ধর্ম কোনো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, এ হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার।

৩. মানতে হবে বিশ্বাসের সম্পর্ক রক্ত বা বংশের সঙ্গে নয়, এর সম্পর্ক সম্পূর্ণই জ্ঞানের সঙ্গে।

৪. মানতে হবে যে, পূর্বপুরুষের ভুল বিশ্বাস অকাট্য যুক্তির দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য।

৫. মানতে হবে যে, পিতার ভুল বিশ্বাস যদি পরিবর্তনযোগ্য না-ই হতো, তাহলে জ্ঞানচর্চার কোনো মূল্যই থাকতো না।

যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, আমাদের দেশের অনেকেরই পিতার বিশ্বাস ছিল–'পৃথিবী একটা গরুর শিং-এর ওপর রয়েছে। সে গরু যখন শিং পরিবর্তন করে তখন ভূমিকম্প হয়।'

www.pathagar.com

আরো বিশ্বাস ছিল যে, 'রাহু' নামক কোনো বিরাট আকারের জন্তু চাঁদকে গ্রাস করতো বলে 'চন্দ্রগ্রহণ' হতো এবং এটাই ছিল চন্দ্রগ্রহণের কারণ। এরপর দেশের ব্রাহ্মণগণের সম্মিলিত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাহু চাঁদকে ছেড়ে দিতেন। এভাবেই চাঁদের অস্তিত্ব টিকে আছে, নইলে বহু পূর্বেই চাঁদ রাহুর পেটে হজম হয়ে যেতো।

পিতার এসব ভুল বিশ্বাস যদি অকাট্য যুক্তির দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে তাহলে ধর্ম সম্পর্কীয় পিতার ভুল বিশ্বাস কি পরিবর্তন হতে পারে না? অবশ্যই পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পিতার ভুল বিশ্বাস ত্যাগ করায় যেমন কারো কোনো ধরনের অমর্যাদা হয়নি বরং মর্যাদা বেড়েছে ঠিক তেমনি ধর্ম সম্পর্কীয় পিতার ভুল বিশ্বাস ত্যাগ করলেও মর্যাদা কমবে না বরং বাড়বে।

এসব কথা যারা মানতে প্রস্তুত তাদেরই চোখে ধরা পড়বে যে, ধর্ম কোনটা ঠিক আর কোনটা বে-ঠিক।

কয়েকটি ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাসীদের ঐকমত্য

যারাই কোনো না কোনো ধর্ম মানে তারাই নিম্নে বর্ণিত চারটি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। যথা ঃ

১. সৃষ্টিকর্তা আছেন। ২. পরকাল আছে ও পাপ-পুণ্যের বিচার হবে। ৩. বিচারের পর যার যার কর্মফল সে সে ভোগ করবে। সেদিন অপরাধী শাস্তি ভোগ করবে এবং নিরপরাধ ব্যক্তি মুক্তি পাবে এবং পুরস্কৃত হবে। ৪. পরকালের মুক্তি সবারই কাম্য।

বেশি নয়, এ ৪টি বিষয়ে যখন আমরা প্রত্যেক ধর্মের লোকই একমত, তখন আসুন আমরা যার যার নিজের স্বার্থেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে খুব গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি যে, পরকালের মুক্তির সঠিক পথ কোনটি এবং মুক্তির পথ সম্পর্কে কোন ধর্ম কি বলে, আর তার মধ্যে কার কথা কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য? আসুন এগুলো সুস্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখি।

দেখুন, রোগের চিকিৎসার বেলায় যেমন ডাক্তার ও ওষুধের প্রতি রোগীকে আস্থাশীল হতে হয়, ঠিক তেমনি পরকালের মুক্তির ব্যাপারেও একটা পন্থার ওপর সম্পূর্ণ নিজেকেই আস্থাশীল হতে হয়। তাই প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির উচিত তার নিজের স্বার্থেই পরকালের মুক্তির সঠিক পথ নিজেই বেছে নেয়া।

www.pathagar.com

পরকালে মুক্তির পথ একটাই

অনেকের ধারণা, যার যার ধর্মে সে সে পালন করলে প্রত্যেক জাতির লোকই পরকালে মুক্তি পাবে।

কিন্তু এ ধারণা কি ঠিক? এর সঠিক জবাব পেতে হলে আপনাকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আল্লাহর নিকট মানুষের পরিচয় কি 'জাতি' হিসেবে, না-কি 'মানুষ' হিসেবেই?

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট মানুষের পরিচয় 'মানুষ' হিসেবেই। লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহর প্রত্যেকটি ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের জন্য একইভাবে কার্যকর রয়েছে। যেমন দেখুন, খাদ্যের ব্যাপারে প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুই প্রত্যেক জাতির লোকদের জন্য একই ধরনের ফল দেয়। ঠিক তেমনি রোগের চিকিৎসার বেলায়ও প্রত্যেক জাতির লোকের একই রোগে একই ওষুধ প্রয়োজন হয়।

আমরা এমনটি কখনো দেখি না যে, মুসলমানদের কলেরায় স্যালাইন, হিন্দুদের কলেরায় কুইনাইন, খ্রিস্টানদের কলেরায় এটেভীন, বৌদ্ধদের কলেরায় স্যাফাক্রিন এবং নাস্তিকদের কলেয়ার নোভালজীন। এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা যেমন পার্থিব জীবনে নেই, ঠিক তেমনি পরকালীন জীবনেও বিভিন্ন জাতির মুক্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই।

যেকোনো জাতির লোকের একই রোগের যেমন একই ওষুধ প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি পরকালের জীবনেও একই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রত্যেকের মুক্তি আসবে এটাই যুক্তি।

একই রাষ্ট্রে যেমন এমন কোনো আইন থাকতে পারে না যে, কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, আর কেউ চুরি করলে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। ঠিক তেমনি আল্লাহর আইনও এমন হতে পারে না যে, কেউ দেবতার পূজা করলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং আরেকজন তা করলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে বা তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

সঠিক যুক্তি হচ্ছে এই যে, একই আল্লাহর আইন তার সৃষ্ট সকল মানুষের জন্য একই ধরনের হতে হবে। অর্থাৎ পরকালের মুক্তির জন্য হরিদাস বাবুর জন্য যদি দুর্গাপূজার দরকার হয়, তবে আবদুল্লাহ সাহেবের জন্য তা দরকার হবে এবং দরকার হবে তা পোপ পলের জন্যও।

www.pathagar.com

আর যদি পরকালের মুক্তির জন্য ইসলামী বিধান মেনে চলার প্রয়োজন হয়, তবে এটাই প্রয়োজন হবে সকলের জন্য। এটাই যুক্তি এবং এটাই বিবেকের সাক্ষ্য। এছাড়া বিবেক আরো সাক্ষ্য দেবে যে, এন্ড্রিন যেমন সব জাতির মানুষের জন্যই বিষ, ঠিক তেমনি পরকালের জীবনের জন্য যা বিষবৎ বা যা হবে জাহান্নামের কারণ তা সকল জাতির লোকদের জন্যই হবে জাহান্নামের কারণ।

এখন প্রশ্ন, তাহলে মুক্তির সঠিক পথ কোনটা? যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখি যে, কোন পথটা আল্লাহর দেয়া। যুক্তিতে যেটাই আল্লাহর দেয়া সঠিক পথ হিসেবে ধরা পড়বে, আসুন আমরা সেটাকেই গ্রহণ করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে যাই। কারণ মৃত্যুর হাত থেকে যখন বাঁচার কোনো পথ নেই, মরতে যখন হবেই আর মরার পরে যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে যেতে হবে এবং সেখানে যেহেতু কোনো গোঁড়ামী কাজে লাগবে না, আর যেহেতু সে জীবনের সুখ-শান্তিও আমরা চাই, তাই যার যার নিজের স্বার্থেই আসুন আমরা সবধরনের গোঁড়ামী দূর করে নিরপেক্ষভাবে যাচাই বাছাই করে দেখি যে, ধর্ম আসলে কোনটা আল্লাহর দেয়া, কোনটা মানুষের তৈরি।

আল্লাহর ধর্ম সকলের নিজের ধর্ম

মনে রাখতে হবে আল্লাহর দেয়া আবহাওয়া যেমন সকলের জন্যই, ঠিক তেমনি আল্লাহর দেয়া ধর্ম প্রত্যেকের জন্যই। আল্লাহর দেয়া চাঁদ-সূর্য যেমন কোনো গোষ্ঠীবিশেষের জন্য নয় তেমনি আল্লাহর ধর্মও কোনো গোষ্ঠীবিশেষের নিজস্ব কিছু নয়। একই মায়ের ১০ জন পুত্রের জন্য তাদের মা যেমন কারো একটু 'বেশি মা' এবং কারো একটু 'কম মা' নয়, ঠিক তেমনি ইসলাম যদি আল্লাহর দেয়া ধর্ম হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে তা (ইসলাম) কারো জন্য 'কম' এবং কারো জন্য 'বেশি' অধিকারের হবে না। তা হবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব ধর্ম। যেমন ১০ জন সন্তানের মা তার প্রত্যেক সন্তানের সমাধিকারের মা।

অন্যান্য ধর্ম সৃষ্টি হলো কি করে

হযরত আদম (আ) প্রথম মানুষ ছিলেন এবং প্রথম নবীও ছিলেন। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই বিবেক-বুদ্ধিকে আল্লাহ কিভাবে কাজে লাগাতে চান তা বলে দেয়ার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে, ভিন্ন কথায়, মানুষের সঠিক জীবন-ব্যবস্থা কি হবে তা বলে দেয়া ও শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠান। আর তা পাঠানোর ধারা হলো, যখন যে ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তখন সেই ধরনের সমাধান দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এভাবে ১ লাখ ২৪ হাজার অথবা ২ লাখ ২৪ হাজার পয়গাম্বর আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

তাহলে একথাও মানতে হবে যে, আমাদের এদেশেও কোনো নবী বা রাসূল এসেছিলেন, যাঁদের নাম আমাদের জানা নেই। হয়ত হতে পারে যে, শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের যুগে তাঁরা নবী ছিলেন। তাঁরা নবী 'ছিলেন' একথাও যেমন বলছি না তেমনি তাঁরা নবী 'ছিলেন না' একথাও বলা যায় না। কারণ আল-কুরআনে সব নবীর নাম নেই, কিন্তু নবীর সংখ্যা অনেক ছিল এটা আমরা অবশ্য বিশ্বাস করি। এ কারণেই বলেছি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগে হয়তো তাঁরা নবী ছিলেন এবং তাঁরা তাওহীদেরই প্রচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তগণ হয়ত ইতিহাস বিকৃত করে তাঁদের নামে কোনো কলঙ্ক জুড়ে দিয়েছে এবং পরবর্তী নবীকে গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে মানতে না পেরে তারা পূর্ব নবীর অনুসারী থাকার নাম করে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করে নিয়েছে। যেমন মুসা (আ)-এর কিছু উম্মত গোঁড়ামীর কারণে পরবর্তী নবী হযরত ঈসা (আ)-কে মানতে না পেরে তারা ইহুদী জাতিতে পরিণত হলো।

ঠিক ঐ একই কারণে হযরত ঈসা (আ)-এর কিছু উম্মত পরবর্তী ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মানতে না পেরে খ্রিস্টান জাতিতে পরিণত হলো। এভাবেই বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা মুসলমান জাতি এমন একটা কথায় বিশ্বাস করি, যা অন্যকোনো জাতিই বিশ্বাস করতে পারে না। পারলে তাদের ধর্মও আর টেকে না, তা হচ্ছে এই যে, আমরা সব নবীকেই মানি। আর তা না মানলে আমরা 'মুসলমান' থাকতে পারি না। কিন্তু অন্যকোনো জাতিই সব নবীকে মানতে পারে না। আমরা যে সব নবীকে মানতে পারি এবং কিভাবে মানি তা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করছি ঃ

যেমন, আমাদের এ উপমহাদেশে এমন একদিন ছিল যেদিন ব্রিটিশ সরকারের রাজত্ব ছিল। তখন আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম ব্রিটিশ সরকারের নাগরিক। পরে এলো পাক সরকার। তখন আমরা ছিলাম পাক সরকারের নাগরিক। তারপর এলো বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে আমরা বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সরকারের নাগরিক। এখন আমরা প্রত্যেকেই ব্রিটিশ সরকার ও পাক সরকারকে 'এককালের সরকার' হিসেবে মানি ঠিকই, কিন্তু আইন মেনে চলি বর্তমান সরকারের।

এই সরকারের আমলে যদি কেউ দাবি করে যে, আমি ব্রিটিশ সরকারের আইন মেনে চলবো এবং বর্তমান সরকারের আইন মানবো না তাহলে সে ব্যক্তি যে পর্যায়ের অপরাধী হবে ঠিক সেই একই পর্যায়ের অপরাধী হবে তারা, যারা বর্তমান শেষ নবীর আমলের মানুষ হয়ে পূর্ববর্তী নবীর আইন মেনে চলতে চাইবে।

আমরা মুসলিম জাতি অন্যান্য সব নবীকেই মানি। যেমন এ উপমহাদেশের সকলেই ব্রিটিশ সরকারকে তদানীন্তন আমলের সরকার বলে মানি। ধর্মের বেলায়ও ঐ একই নীতি মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ যদি শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ সত্যিই আল্লাহর পাঠানো নবী হতেন, আর আমরা যদি সেই যুগের মানুষ হতাম, তাহলে তাদের আইন বা শরীয়ত আমাদের মেনে চলতে হতো। কিংবা যদি হযরত ঈসা (আ) বা মুসা (আ)-এর যুগের মানুষ হতাম তবে তাঁদের আইনই আমাদের মেনে চলতে হতো। নইলে অবশ্যই আমাদেরকে জাহান্নামী হতে হতো। কিন্তু যেহেতু আমাদের জন্ম হয়েছে শেষ নবীর আমলে তাই আমাদের মেনে চলতে হবে শেষ নবীকেই।

এতটুকু সহজ সরল বুঝ যাদের মস্তিষ্কে ঢুকে যায় তারা আর অমুসলিম থাকতে পারে না, যার নজির শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান।

'ইসলাম' একমাত্র খাঁটি ধর্ম

'ইসলামই একমাত্র খাঁটি ধর্ম' অন্য কথায় সৃষ্টিকর্তা মনোনীত জীবন বিধান। তার সপক্ষে অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। পাঠকদের খেদমতে নিম্নে কয়েকটি সহজ যুক্তি পেশ করছি।

১ নং যুক্তি ঃ ধর্মের নামকরণের সার্বজনীনতা

যা খাঁটি ধর্ম তার নামটাও হবে একটা যুক্তিসঙ্গত নাম। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ পৃথিবীতে মোট যত ধর্ম আছে তার প্রত্যেকটির নামই সেই ধর্মের প্রবর্তকের নামানুসারে হয়েছে। যেমন যীশুখ্রিস্টের নামানুসারে খ্রিস্টান

www.pathagar.com

ধর্ম, মহাবীর জৈনের নামানুসারে জৈনধর্ম, গৌতম বুদ্ধের নামানুসারে বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দের নামানুসারে হিন্দু ধর্ম, কিন্তু ইসলাম ধর্মের নাম কোনো ব্যক্তির নামানুসারে নয়।

যদি এ ধর্মের নাম 'মুহাম্মদী' ধর্ম হতো তাহলে নামকরণের দিক থেকে অন্য ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে অবশ্যই কোনো পার্থক্য থাকতো না। কিন্তু এ (ইসলাম) ধর্মের নাম এমনই একটি সার্বজনীন শব্দ দ্বারা রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কারণ মানব জীবনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে জীবনে শান্তি লাভ করা। আর 'ইসলাম' অর্থও 'শান্তি'।

তাহলে প্রমাণ হলো মানবজীবনে যে নিয়ম-নীতি মেনে চললে জীবনে শান্তি লাভ হতে পারে সেই নিয়ম-নীতিই মানবধর্ম হওয়া উচিত এবং তার নামটাও 'শান্তি' হওয়া যুক্তিযুক্ত। তাই আল্লাহ পাক মানবজীবনের শান্তির জন্য যেসব নিয়ম-নীতি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে দান করেছেন সেইসব নিয়ম-নীতির নাম আল্লাহ রেখে দিলেন 'ইসলাম' বা 'শান্তি'।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, অন্ততঃপক্ষে নামকরণের দিক থেকে 'ইসলাম' নামটা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও সার্বজনীন নাম। সুতরাং অনেক ঐতিহাসিক ইসলাম ধর্মকে 'মানবধর্ম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোনো বিশেষ জাতির ধর্ম নয়, এটা গোটা মানবজাতির ধর্ম।

আল্লাহর দেয়া সূর্যের কিরণ যেমন কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং তা দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের জন্যই, ঠিক অদ্রূপ আল্লাহর দেয়া ধর্মও কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয়, তা প্রতিটি মানুষের জন্যই। সুতরাং এ হেন ধর্মের নাম কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামানুসারে হতে পারে না। এর নামটা হতে হবে সার্বজনীন যেন তা সর্বজনস্বীকৃত হতে পারে। অতএব 'ইসলাম' বা 'শান্তি' কথাটাও যেমন সার্বজনীন এ নামের ধর্মটাও তেমনি সার্বজনীন।

২ নং যুক্তি ঃ ধর্মকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে

যা আল্লাহর দেয়া ধর্ম তা অবশ্যই আংশিক জীবন-ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। কারণ একদিকে আল্লাহকে মানবো সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক হিসেবে, আর অন্যদিকে যদি অন্যকোনো সত্তাকে কোনো বিশেষ বিষয়ের 'ব্যবস্থাপক' বলে মানতে হয় তবে প্রকারান্তরে মানা হয় যে, আল্লাহর বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও কোনো কোনো

www.pathagar.com

বিষয়ে আল্লাহ অজ্ঞ (নাউযুবিল্লাহ)। এটা যেমন আল্লাহ সম্পর্কে অযৌক্তিক ধারণা তেমনি আল্লাহর দেয়া ধর্মকে গ্রহণ করার পর জীবনের যেকোনো ব্যাপারে আর অন্যকারো নিকটেই কোনো কাজের জন্য বিধান চাওয়া যেতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর দেয়া ধর্মকে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে এবং যত ধরনের সমস্যা মানবজীবনে সৃষ্টি হতে পারে তার সব সমস্যার সমাধান আল্লাহর দেয়া ধর্মে থাকতে হবে এটাই যুক্তি।

দেখা যায় আজ পর্যন্ত যত ধরনের ধর্ম পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই দাবি যে, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এছাড়া আর কোনো ধর্মই একথা দাবি করতে পারেনি যে, তা সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। অর্থাৎ মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামে পূর্ণাঙ্গ বিধান রয়েছে। ইসলামে রয়েছে শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ-সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের আইন-কানুন যা অন্যকোনো ধর্মে নেই।

৩ নং যুক্তি ঃ ধর্মীয় আইন হতে হবে নির্ভুল

দেখা যায় পৃথিবীতে এমন অনেক ধর্ম রয়েছে যার ধর্মীয় আইন মানুষকেই সংশোধন করতে হয়। যেমন 'সতীদাহ প্রথা' ছিল হিন্দুদের জন্য একটা ধর্মীয় আইন, যা মানুষের নজরে 'ভুল আইন' হিসেবে ধরা পড়লো। ফলে ঈশ্বরের ভুল আইন মানুষকেই সংশোধন করতে হলো। তাই অনেকেই বিভিন্ন ধর্ম থেকে এসে কেন মুসলমান হয়েছে তার জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন–'অন্যান্য ধর্মের ভুলত্রুটি সংশোধন করে মানুষ, আর মানুষের ভুলত্রুটি সংশোধন করে ইসলাম। ইসলামের এই মাহাত্ম্য দেখেই মুসলমান হয়েছি।'

এ গৌরব একমাত্র ইসলাম করতে পারে যে, এর কোনো একটি কথাও অবৈজ্ঞানিক নয়।

৪ নং যুক্তি ঃ ধর্মীয় বিধান পক্ষপাতহীন হতে হবে

সৃষ্টিকর্তা যেমন সবার কাছে সমান তেমনি তাঁর আইনও হতে হবে সবার জন্য সমান অর্থাৎ কুরআন আল্লারহ বাণী হিসেবে কুরআনের প্রতি সবার থাকতে হবে সমাধিকার। অবশ্য ইসলামের ক্ষেত্রে তা আছেও।

www.pathagar.com

কিন্তু দেখা যায় কোনো কোনো ধর্মের ব্যাপারে তা নেই। যেমন হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ 'বেদ'-এ শুদ্রদের কোনো অধিকার নেই।

তাছাড়া ইসলামে যা ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম রয়েছে তা সকলের জন্য একই হুকুম অর্থাৎ সকলকেই একই নিয়মে ইবাদত করতে হবে। এখানে কারো জন্যই কিছু মাফ নেই বা কনসেশন নেই। কিন্তু কোনো কোনো ধর্মে দেখা যায় উপাসনা সবাইকে করতে হয় না। এমনকি সবার উপাসনা করার অধিকার পর্যন্ত নেই। যেমন হিন্দু ধর্মে উপাসনার যাবতীয় মন্ত্র পাঠ ও অনুষ্ঠানাদি পালন করে শুধুমাত্র পুরোহিতগণ, আর অন্যানরা শুধু সেখানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি করে মাত্র। তাদের কোনো মন্ত্র পড়ার প্রয়োজন হয় না।

খ্রিস্টানদেরও সবাইকে সমানভাবে একই নির্দিষ্ট পন্থায় কোনো উপাসনা করতে হয় না, যেমন করতে হয় মুসলমানদের নামায-রোযাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাছাড়া দেখা যায় হিন্দুদের বেলায় এমন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে যা অবশ্যই পক্ষপাতমূলক। যেমন পূজার পৌরোহিত্ব করার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই আছে এবং তা আছে জন্মসূত্রে। এতে আর কারো কোনো অধিকার নেই তা সে যতই ধার্মিক হোক না কেন।

শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণদের পূজা-অর্চনার যে অধিকার রয়েছে সে অধিকার কেড়ে নেয়ারও অধিকার কারো নেই তা সে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ কাট্টা নাদান কিংবা চারিত্রিক দিক থেকে সর্বজন ধিকৃত হলেও। তাছাড়াও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পিতা-মাতার মৃত্যুতে কিছুদিন শোক পালন করতে হয় তার মেয়াদ হচ্ছে ৩০ দিন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বেলায় পালন করতে হয় মাত্র ১১ দিন। পক্ষান্তরে ইসলামের বিধান অনুযায়ী আজই যদি কোনো মুচি-মেথরও মুসলমান হয় তবে কালই সে ব্যক্তি একজন আওলাদে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়েও ইমামতি করার অধিকার রাখে। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র ইসলামেই কোনো ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব নেই। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মে দস্তুরমতো পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

খ্রিস্টানদের বেলায় উপাসনা ধর্মযাজকদের জন্য। আর অন্যানদের জন্য শুধু যীশুখ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাতেই নাকি তাদের মুক্তি।

কিন্তু ইসলামের বেলায় সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। এখানে শুধু বিশ্বাসে কোনোই ফায়দা নেই। তাকে বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিটি কাজই আল্লাহর বিধান অনুসারে করতে হবে–এতে কারো কোন কনসেশন নেই।

www.pathagar.com

৫ নং যুক্তি ঃ পৈতৃক ধর্মের চেয়ে অধিক যুক্তিগ্রাহ্য না হলে কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে না

যারা অশিক্ষিত ও ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের বাদ দিলে দেখা যায়, যারাই শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি তারা কেউই কোনোদিন ইসলাম ধর্মের চেয়ে অন্য ধর্মকে অধিক যুক্তিগ্রাহ্য মনে করে সেই ধর্ম গ্রহণ করেছে এমন কোনো কথা ইতিহাস নেই।

পক্ষান্তরে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তির কথা আছে, এমনকি অনেক রাজা-বাদশাহর কথা ইতিহাসে আছে যে, তারা ইসলামের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অশিক্ষিত লোককে–যারা আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল তাদেরকে অর্থের লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টান করা হয়েছে এমন ইতিহাস যে আছে আমি স্বীকার করি। কিন্তু এমনটি কেউ দেখাতে পারবে না যে, কোনো ধার্মিক মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে বা ইসলামের ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করে এ ধর্মের অসারতা দেখে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং খ্রিস্টান বা হিন্দু হয়ে নব-খ্রিস্টান বা নব-হিন্দু নাম দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যেমন নও-মুসলিম মরহুম মাওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য নও-মুলসামানদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এরকম কি কোনো নজির আছে পৃথিবীর ইতিহাসে?

অর্থাৎ মাওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য যেমন হিন্দুদের পুরোহিত হয়ে হিন্দুধর্ম ভালোভাবে পড়াশোনা করে দেখলেন এটা ভুল। পরে খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখে বুঝলেন এটাও অচল। এরপরে ইসলামের ওপর পড়াশোনা করে বুঝলেন যে, এটাই সঠিক। অবশেষে এটাই তিনি গ্রহণ করলেন এবং কেন তিনি খ্রিস্টান হলেন না এবং কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য কতগুলো মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করলেন। আর সে মহাসত্যকে গোটা জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য যেভাবে একটা সংগঠন গড়ে তুললেন তেমন কোনো ঘটনা পৃথিবীর কোথাও কোনোদিন ঘটেছে, তার কি কোনো প্রমাণ আছে?

অর্থাৎ মাওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য যেমন ছিলেন হিন্দু জাতির পুরোহিত তেমনি মুলসমানদের কোনো ইমাম সাহেব কি ইসলাম ধর্মের যাবতীয় গ্রন্থাদি পড়ে ইসলামের অসারতা বুঝতে পেরে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ

www.pathagar.com

করে অন্যকোনো বই-পুস্তক রচনা করেছেন যেমন করেছেন মরহুম ভট্টাচার্য সাহেব। গোটা পৃথিবীর ইতিহাস মন্থন করেও কি এই ধরনের কোনো নজির উপস্থিত করতে পারবেন? তা অবশ্যই কেউ পারবেন না।

৬ নং যুক্তি ঃ ধর্মীয় গুরু ব্যক্তিগণকে হতে হবে সবার জন্য আদর্শ

কোলকাতা ইউনিভারসিটি থেকে এম.এসসি পাস একজন নও -মুসলিমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম–'আপনি কী দেখে মুসলমান হলেন?'

তিনি জবাবে বললেন–'হিন্দুদের যারা পূজনীয় ব্যক্তি তাদের আদর্শ যদি আজ পৃথিবীর সর্বত্র কায়েম হতো তবে সারা পৃথিবীর অবস্থা আজ কি হতো তা চিন্তা করে আমি মুসলমান হয়ে গেছি।'

তিনি বললেন–'আজ যদি দেশের যুবক ছেলেরা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণ করে পুকুরে গোসল করতে নামার পরে যুবতী মেয়েদের কাপড় নিয়ে গাছে উঠে বসে থাকে তাহলে সমাজের অবস্থা কেমন দাঁড়ায়! বিশেষকরে এই বিংশ শতাব্দীতেও শিবের লিঙ্গ পূজার মতো দৃষ্টান্ত রয়েছে। এসবও কি ধর্মীয় কাজ হতে পারে? এসব দেখে-শুনে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি চিন্তা করেছি যে, কোথায় হিন্দুদের ভগবানের লীলা- আর কোথায় মুসলমানদের নবী-রাসূলগণের আদর্শ চরিত্র। এসব চিন্তা-ভাবনা করে আমি আর হিন্দু থাকতে পারলাম না।'

আরো বললেন–'যদি আজ দ্রৌপদীর মতো কেউ পাঁচটা স্বামী গ্রহণ করে তাহলেইবা সমাজের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়।'

এই ধরনের অনেকের কথাই তিনি বললেন যা তার মুখে নও-মুসলিম হিসেবে শোভা পেলেও আমার কলমে লেখা আমি লজ্জাষ্কর মনে করে লিখলাম না। কিন্তু হিন্দু ভাইয়েরা প্রত্যেকেই মনে মনে তা বুঝবেন।

৭ নং যুক্তি ঃ আল-কুরআনই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানসম্মত ধর্মগ্রন্থ

একদিকে যেমন ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মই একখানা পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ দিতে পারে না তেমনি কুরআনে এমনসব বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা নাযিল হয়েছে ১৪ শত বছর পূর্বে, আর তার সত্যতা প্রমাণ হচ্ছে আজ এই বিংশ শতাব্দীতে। এই কুরআনের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আর

www.pathagar.com

কোনো ধর্মগ্রন্থেই নেই। যথা ঃ

১. কুরআনের ভাব-ভাষা এমনভাবে সুবিন্যস্ত যার অনুরূপ একটি সূরা আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি।

২. যার উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো বা কোনো কথাকেও আজ পর্যন্ত কেউ অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করতে পারেনি।

৩. পৃথিবীর সব ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যদি পুড়িয়ে দেয়া হয় তবে নতুন করে হাফেজদের মাধ্যমে শুধুমাত্র কুরআন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এছাড়া অন্যকোনো ধর্মগ্রন্থই পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।

৪. সর্বশেষ মিশরের তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ রাশেদ খলিফার দ্বারা এমন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার হয়েছে যা সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, আল-কুরআনের শব্দ, অক্ষর, যের, যবর, পেশ ও নোক্তা ইত্যাদির প্রত্যেকেটির মধ্যে এমন এক নিখুঁত হিসাব রয়েছে যা কম্পিউটারে ধরা পড়বে বা গণনায় মিল পড়বে যা রচনা করা কোনো আদম সন্তানের পক্ষেই সম্ভব নয়। এ ধরনের হিসাব-নিকাশ করে কোনো গ্রন্থ কেউ লিখতে পারে না।

যেমন তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ রাশেদ খলিফা হিসাব করে দেখেছেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর মধ্যে অক্ষর রয়েছে ১৯টি। তিনি দাবি করেন, গোটা কুরআনের মধ্যে এই ১৯ সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্ববহ। তিনি হিসাব করে দেখেছেন 'ইস্‌ম' শব্দটি কুরআনে ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'বিস্‌ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩ বার। এই দুই সংখ্যাকে গুণ করলে গুণফল হয় ১৯×৩=৫৭। এই ৫৭ বারই আল-কুরআনে 'আর-রাহমান' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে, আর 'রহম' শব্দটি আল-কুরআনে এসেছে ১১৪ বার এবং এই ১১৪টিই হচ্ছে কুরআনের মোট সূরার সংখ্যা, আর এই ১১৪ সংখ্যাই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

এছাড়াও তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন, যেসব সূরার পূর্বে কাটা কাটা অক্ষর রয়েছে যেমন–'আলিফ–লাম–মীম, ইয়া-সীন, আলিফ-লাম-রা, ত্বা-হা' ইত্যাদি। এই ধরনের সূরা মোট ২১টি রয়েছে। এসব সূরার অক্ষর কম্পিউটারের সাহায্যে হিসাব করে দেখা গেছে যে, সূরার পূর্বে যে পৃথক পৃথক অক্ষর দিয়ে সূরা আরম্ভ করা হয়েছে, ঐ অক্ষর গোটা সূরার মধ্যে যতবার আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন সূরা ক্বাফ-এর মধ্যে 'ক্বাফ' অক্ষরটি আছে ৫৭ বার, এই ৫৭ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এভাবে সূরা

www.pathagar.com

ইয়াসীনের 'ইয়া' যতবার আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য এবং 'সীন' যতবার আছে তা-ও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। বলুন, এভাবে হিসাব-নিকাশ করে কোনো বই লেখা মানুষের দ্বারা কি সম্ভব?

৮ নং যুক্তি ঃ ধর্মের দৃষ্টিতে সাধু ব্যক্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে যারা সাধু বা পুণ্যবান ব্যক্তি তাঁরা হচ্ছেন হাক্কানী আলেম, পীর-বুজর্গ, সুফি-দরবেশ ইত্যাদি–যাঁরা কেউই অশিক্ষিত নন। যাদের চরিত্রে কোনো খুঁত নেই তাঁরাই হচ্ছেন ইসলামের দৃষ্টিতে সাধু এবং তাঁরা সংসারত্যাগী নন।

হিন্দু ধর্মমতে, যারা সাধু তাদেরকে দেখা যায় অশিক্ষিত, গেরুয়া বসন পরিহিত, চিমটাধারী, সংসারত্যাগী, শ্মশানে বসবাসকারী। যাদের সঙ্গে কিছু বিধবা নারী কদুর খোল হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন ও শ্মশানে একত্রে বসবাস করেন। আর কোলকাতার কালীঘাট মন্দিরের সামনে দেখা যায় কিছুলোক মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল রাখেন আর সমস্ত শরীরে ছাই মেখে উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকেন। তাদেরকে বলা হয় নেংটা সাধু। আর বিদেশীদের নিকট 'পায়াস' ও 'অনেস্ট ম্যান' বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় তাদেরকেই।

অন্যদিকে খ্রিস্টানদের যারা ধর্মীয় নেতা অথবা সাধু তারা কিন্তু একজনও বিবাহিত নন। সুতরাং তারা একজনও সাধুর ব্যাটা সাধু নন। অর্থাৎ যারা ফাদার, বিশপ বা পোপ তারা কেউই ফাদার, বিশপ বা পোপের পুত্র নন, কারণ তাদের পিতা পোপ, বিশপ বা ফাদার হলে তো বিবাহই করতেন না। সুতরাং প্রথমেই একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, আর যা-ই হোক, তারা কোনো ধার্মিক লোকের সন্তান নন। তাছাড়া এসব ধার্মিক যারা বিবাহিত নন এবং যারা সিস্টারদের সঙ্গেই বাস করেন, আর যাদের মধ্যে মানবীয় যৌনপ্রবৃত্তি রয়েছে তারা কি এ কথা বলতে পারেন যে, তারা রমণী স্পর্শ করেন না?

তারা যদি বলেনও তবু কি মানুষ এ যুক্তিবিরোধী কথা মেনে নিতে পারবে? তবে দৃষ্টিভঙ্গি যদি তাদের এমন হয় যে, ধর্মগুরুর বিবাহটাই দোষের কাজ কিন্তু যৌনাচরণটা কোনো দোষের কাজ নয়, তবে সেটা ভিন্ন কথা। তবে হ্যাঁ, একথা সত্যি যে, দুনিয়ার প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর বিধানের অধীন। কাজেই আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন বাঁচতে হলে খাওয়া, পান করা, প্রস্রাব-পায়খানা, ঘুম ইত্যাদি

www.pathagar.com

বাদ দিয়ে বাঁচা যায় না, ঠিক তেমনি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করাটাও যেহেতু আল্লাহর বিধান, সুতরাং আল্লাহর এ বিধানকে বাদ দিয়েও চলা যায় না। আল্লাহর এ বিধানটাকে অর্থাৎ যৌনপ্রবৃত্তিকে যারা দমন করে রাখার দাবি করেন তারা হয় তাদের অবৈধ যৌনাচরণের কথা গোপন করেন অথবা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেন যা সহ্য করা সাধ্যের বাইরে।

একটি প্রশ্ন ঃ একটি চিন্তায় বিষয়

ধরুন পৃথিবীর তিনটি ভূখণ্ড বাংলাদেশের তিনটি ধর্মের সাধু ব্যক্তিদের জন্য বেছে নেয়া হলো–একটি হিন্দুদের, আরেকটি খ্রিস্টানদের এবং অন্যটি মুসলমান সাধু ব্যক্তিদের জন্য। এরপরে এক একটা ভূ-খণ্ডে এক এক জাতের সাধু ব্যক্তিদের রেখে আসুন, এর কিছুদিন পরে ঐ ভূ-খণ্ডগুলো ভিজিট করে আসুন, দেখুন কোনটার কি অবস্থা হয়েছে।

হিন্দু সাধুদের ভূ-ভণ্ডে গেলে আপনার সবকিছু দেখে মনে হবে যেন ৫/৬ হাজার বছর পূর্বের দুনিয়ায় এসে পড়েছেন। অর্থাৎ ৫/৬ হাজার বছর পূর্বে বন-জঙ্গলে বসে যেসব মুনি-ঋষি তপজপ করতেন সেখানে এসে পড়েছেন। সেখানে দেখা যাবে কদুর খোল হাতে বৈরাগীদের আর দেখা যাবে সন্ন্যাসীদের। তাদের বেশির ভাগ দেখা যাবে শ্মশানঘাটে। আর কোলকাতার কালীঘাট মন্দিরের সামনে গায়ে ছাই মাখানো যেসব উলঙ্গ সাধু আছে তাদেরকেও সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে। যা দেখে মনে হবে যেন সভ্যতার কোনো ছোঁয়া তারা পায়নি।

২ নং ভূ-খণ্ড যেখানে খ্রিস্টান সাধু ব্যক্তিগণ বাস করেন সেখানে ৫০ বছর পর একটি লোকও পাবেন না। কারণ তাদের যারা সাধু তারা কেউই বিবাহিত নন। সুতরাং ৫০ বছর পর নতুন কোনো সন্তান-সন্ততিও সেখানে জন্ম নেবে না। ফলে সে ভূ-খণ্ড জনশূন্য হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। আর পৃথিবীর সব খ্রিস্টান যদি সাধু হয়ে যায় তবে ৫০ বছর পর এ পৃথিবীতে আর একটি খ্রিস্টানও পাওয়া যাবে না। এ কারণেই তাদের ধর্মে সবার ধার্মিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

আরেকটি একান্ত সত্যি কথা হলো এই যে, খ্রিস্টানদের কোনো সাধুই সাধুর বেটা নয়, কারণ তার পিতা সাধু হলে তো বিয়েই করতেন না। তাদের যত সাধু সবাই কিন্তু সাধারণ লোকের ছেলে।

আমি বলি না তারা কোনো খারাপ লোকের ছেলে। তবে তারা যে কোনো সাধু ব্যক্তির সন্তান নন, এটা তাদের ধর্মেরই বিধান, এটা তাদের নামে কোনো গালাগালি নয় বা কোনো ধরনের কুৎসাও নয়। যা বাস্তব শুধু

www.pathagar.com

তাই বলছি। তবে হ্যাঁ, একটি কথা বলা দরকার, তা হচ্ছে এই যে, একমাত্র ঈসা (আ) ছাড়া সব নবীই বিয়ে করেছেন। আর ঈসা (আ)-এর অনুগত অনুসারী হওয়ার জন্য খ্রিস্টান সাধুগণ বিয়ে করেন না। কিন্তু তার মধ্যে এমন একটি মহাসত্য লুক্কায়িত আছে যা হয়ত খ্রিস্টান সাধুগণ চিন্তা করেন না। তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা (আ) ছিলেন বিনা পিতার সন্তান, তাই হয়ত দৈহিক পৌরুষত্বের দিক দিয়ে তিনি জন্মসূত্রেই কিছুটা দুর্বল ছিলেন– যার ফলে তিনি বিয়ের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নবী হিসেবে বিয়ে করতে কাউকে নিষেধ করেননি।

তৃতীয় ভূ-খণ্ডে যেখানে মুসলমান সাধুদের রেখে আসা হয়েছিল সেখানে গেলে দেখা যাবে একটা বেহেশতী কল্যাণ রাষ্ট্র সেখানে কায়েম হয়ে গেছে। মুসলমানদের সাধু ব্যক্তি যেহেতু প্রতিটি বিভাগেই আছে তাই মুসলমান সাধুদের বেছে নিলে সেখানে যেমন পুরুষ যাবে তেমনি মেয়েও যাবে। সেখানে যেমন আলেম মৌলভী যাবেন তেমনি সেখানে কুলি-মজুরও যাবে। সেখানে প্রত্যেক বিভাগের কর্মচারী থাকবেন। পুলিশ-মিলিটারীও থাকবেন, সব ধরনের কারিগরও থাকবেন এবং ব্যবসায়ীও থাকবেন। কারণ মুসলমানদের সুফি-মুত্তাকীন পরহেজগার লোক সবক্ষেত্রেই আছে। আর এই ধরনের সৎলোকগুলোই যদি কোনো এক ভূ-খণ্ডে একত্রিত হতে পারেন তবে সেখানে যে বেহেশতী রাষ্ট্র কায়েম হবে তা না বললেও বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এবার চিন্তা করুন যে ধর্মের সাধু ব্যক্তিদের দ্বারা একটা দেশ চলতে পারে না সে ধর্ম কি করে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হতে পারে? এই যুক্তিতে খ্রিস্টান ধর্ম যে যুক্তগ্রাহ্য নয় তা প্রমাণ হলো। অতঃপর হিন্দু-সাধুদের বেলায় দেখুন, তাদের সাধুদের ভূ-খণ্ডকে কেউ কি সভ্য লোকের ভূ-খণ্ড হিসেবে স্বীকার করবে? তবে হ্যাঁ, যারা যুক্তি মানতে নারাজ তাদের কথা আলাদা। আমার-আপনার দায়িত্ব হলো লোকদের বুঝানো। আপনি আমাকে বুঝাবেন, কিন্তু আমি যদি না বুঝার শপথ করি তবে কেউই আমাকে বুঝাতে পারবে না।

যেমন আমি যদি জিদ ধরি যে, আমার পিতার বিশ্বাস ছিল পৃথিবী একটা গরুর শিং-এর ওপর আছে, আমি সে বিশ্বাস কিছুতেই ত্যাগ করবো না, তবে আপনার কি করার আছে বলুন। এমন লোকও আমাদের সমাজে কিছু আছে। তাদের ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই এবং কিছু করারও নেই।

www.pathagar.com

আরেকটি চিন্তার বিষয়

কোনো ধর্ম কি কোনো 'আঞ্চলিক ধর্ম' হতে পারে? সকলেই বলবেন তা পারে না। এবার চিন্তা করুন হিন্দু ধর্মের যাবতীয় ইতিহাস আর কর্মকাণ্ড নিয়ে–যা সব-ই ভারতকেন্দ্রিক। তাহলে প্রশ্ন, হিন্দুদের ভগবান কি শুধু ভারতই চেনেন এবং অন্যান্য দেশ সম্পর্কে কি তিনি কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না? আর তা যদি রাখতেন-ই তবে অন্য দেশ সম্পর্কে কিছু না কিছু কথা তো বেদ-পুরানে থাকতো। যেমন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ আল-কুরআনে শুধু পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্য দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি–মাটির নিচ, সমুদ্রের তলদেশ, আকাশ ও সাত তবক আকাশের ওপরে কোথায় কি আছে না আছে সেই বিষয়ে কোনো তথ্য দিতেও ভুল করেনি। শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী হিন্দু ভাইয়েরা কি এসব বিষয় নিয়ে কখনো কোনো চিন্তা-ভাবনা করেন না?

আমার একান্ত অনুরোধ, পরকালের মুক্তির জন্য যার যার নিজের স্বার্থে আমার কথাগুলো খুবই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করবেন। দেখুন, মৃত্যুর পর এমন একটা সময় আসবে যখন আর চিন্তায় সময় থাকবে না এবং ঐ জীবনের কোনো শেষও হবে না। তাই বলি অত্যন্ত সরল নিরপেক্ষ মন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, সত্যিই আপনার গোঁড়ামীর কারণে যদি আপনার অনন্তকালের জীবনকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করতে হয় তবে সেটাই কি ভালো হবে? নাকি এখন থেকে সময় থাকতে হুঁশিয়ার হওয়া ভালো হবে। এরপর অবশ্যই এমন একটা দিন আসবে যেদিন প্রত্যেকটি ভ্রান্ত লোক অস্থির হয়ে কাঁদবে এবং বলবে–'লাওকুন্না নামমায়ু আও না'কিলু মা কুন্না ফি আসহাবিস সায়ীর' অর্থাৎ 'হায়! সেইদিন যদি মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনতাম এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে সুস্থ জ্ঞানে বুঝে দেখতাম তাহলে আজ আমাকে এই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হতো না'–এ কথা বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং আসুন আমারও যিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক এবং আপনারও যিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক অন্ততঃ তাঁর কথার গুরুত্ব দিয়ে আমরা সঠিক ধর্ম কোনটা তা বুঝার ও গ্রহণ করার চেষ্টা করি।

অতঃপর আমি পূর্ণ ঈমান ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করছি যে, মৃত্যুর পর অবশ্যই এমন একটা দিন আসবে যেদিন চোখের সামনে বেহেশত থাকবে এবং দোযখও থাকবে। তখন অবশ্যই মনে করতে হবে যে, আহা কতই না ভালো হতো যদি দুনিয়ার জীবনে সঠিক ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতাম এবং সুস্থ বিবেকের বুঝ মানতাম।

www.pathagar.com

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, বনি আদম হিসেবে অর্থাৎ একই আদি পিতার সন্তান হিসেবে আপনাদের যেহেতু আমি 'ভাই' বলে মনে করি তাই আপনাদের প্রতি আমার ভাই হিসাবে দায়িত্ব রয়েছে আপনাকে আগুনের পথ থেকে ফেরানো ও সত্যের দিকে ডাকা। আমি সেই দায়িত্ব পালন করলাম। আমার ডাকে আপনি সাড়া দিবেন কি না সে দায়িত্ব আপনার।

শিক্ষিত হিন্দু ভাইদের প্রতি একটি নিবেদন

বনি আদম হিসেবে আমি আপনার 'ভাই'। আর 'ভাই' হিসেবেই একটা কথা গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করতে অনুরোধ করবো। চিন্তা করুন, ধর্মের সম্পর্ক হলো বিশ্বাসের সঙ্গে। আর (আমি পূর্বেও বলেছি) বিশ্বাসের সম্পর্ক রক্তের সঙ্গে নয়, এর সম্পর্ক হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে।

১. চিন্তা করুন, আপনার ধর্মগ্রন্থ বলে ঃ বৃহস্পতির স্ত্রী তারার আপত্তি সত্ত্বেও তার সাথে ব্যাভিচার করার কারণে চন্দ্রকে তারা অভিশাপ দেয়। আর এই অভিশাপের কারণে চাঁদ মাঝে মাঝে রাহুগ্রস্ত হয়। যার ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন?

২. চিন্তা করুন, যে মন্ত্রে পাপ খণ্ডন হয় সে মন্ত্র হচ্ছে ঃ

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি তারা মন্দোদরী যথা
পঞ্চ কন্যা স্মররেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম।

অর্থাৎ অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা এবং মন্দোদরী এই পাঁচ কন্যার নাম প্রত্যহ স্মরণ করলে মহাপাপও মাফ হয়ে যায়। যাদের প্রত্যেকের যৌন জীবন সম্পর্কে আপনাদের জানা আছে। তাদের স্মরণে যে ধর্মের পাপ মাফ হয়ে যায় সে ধর্ম কি আজকের সভ্য যুগে চলতে পারে?

৩. এই ধরনের আরো অনেক প্রশ্নকে সামনে রেখে আপনি চিন্তা করুন হিন্দু ধর্ম কি আসলে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির কোন পথ দেখাতে পারে? দেখুন, আপনি যখন বলেছেন যে, 'আমি একজন হিন্দু' তখন ঐসব চরিত্রহীনাদের সঙ্গে হয়ে পড়ছে আপনাদের ধর্মীয় সম্পর্ক।

আর যখনই বিশ্বাস শুদ্ধ করে নিয়ে আপনি বলছেন যে, 'আমি একজন মুসলমান' তখনই আপনার সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে কুরআন-হাদীস ও নবী-রাসূলগণের সঙ্গে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন আল্লাহর বাণী এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল

১ নং যুক্তি ঃ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো লেখকের জন্ম হয়নি যার প্রথমবারের লেখার আর কোনো ভুলত্রুটি সংশোধন করা লাগে না। অথচ কুরআনের কথাগুলো রাসূল (সা) যা শুনেছেন তাই বলেছেন, ঠিক তাই লেখা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও কোনো একটা ব্যাকরণের ভুলও ধরতে পারেননি। এটা কি আল্লাহর কথা ছাড়া সম্ভব? কোনো পাগলও বলবে না যে তা সম্ভব।

২ নং যুক্তি ঃ প্রত্যেকের বাচনভঙ্গির মধ্যে কিছুটা এমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যা একজনের বাচনভঙ্গি অন্যজনের বাচনভঙ্গির সাথে মিল খায় না। আমরা দেখি কুরআন ও হাদীস একই ব্যক্তির নিকট থেকে পাওয়া, কিন্তু দুইটার বাচনভঙ্গি দুই ধরনের। কারণ একটা আল্লাহর কথা, আর অন্যটা রাসূল (সা)-এর কথা।

৩ নং যুক্তি ঃ পৃথিবীতে এমন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্ম হয়নি যিনি সুস্থ শরীরে বলতে পেরেছেন যে, আগামী বছর এই সময়ের পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। কিন্তু রাসূল (সা) তা বলতে পেরেছিলেন। তিনি নবম হিজরীর হজ্জ শেষ হওয়ার পর সূরা 'নাসর' নাযিল হলে প্রায় সোয়া লাখ তৌহিদী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন যার নাম হলো 'বিদায় হজ্জের ভাষণ'। তিনি অহীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে খবর পেয়ে বললেন যে, সামনের হজ্জে আমাকে আর পাবে না। সুতরাং আমার জীবনের শেষ ভাষণ তোমরা শুনে রাখো।

পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের জন্ম হয়েছে। অনেক হেকিম -কবিরাজ ও ডাক্তারের জন্ম হয়েছে, কেউ কি তার মৃত্যুর ৩ মাস পূর্বে সুস্থ শরীরে বলতে পেরেছিলেন যে, আমি আর ৩ মাস পর্যন্ত বেঁচে আছি। এরপর আর থাকবো না? কিংবা কোনো বক্তা কি কোনো ঈদের নামাযের সময় বক্তৃতার মাঝে বলতে পেরেছেন যে, আমি সামনের বছর পর্যন্ত বেঁচে

www.pathagar.com

থাকবো না। তা কেউ পারেনি। কিন্তু রাসূল (সা) হজ্জের মাঠ থেকেই বলেছিলেন যে, সামনের হজ্জে আর আমাকে পাবে না।

আল্লাহ না বললে এরূপ বলা কি করে সম্ভব ছিল?

৪ নং যুক্তি ঃ একসময় পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন 'পৃথিবী স্থির।' একসময় বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হলো–'সূর্য স্থির, পৃথিবী ঘুরেই দিন-রাত হয়।' কিন্তু আল্লাহ চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বলেছেন–'কুল্লুন ফি ফালাকিইঁ ইয়াসবাহুন।' (সূরা ইয়াসিন ঃ ৪০)

অর্থাৎ 'মহাশূন্যের প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রসহ সবকিছুই ঘুরছে।' একই কথা বলা হয়েছে সূরা লোকমানের ২৯ নং আয়াতে, সূরা রা'দ-এর ২ নং আয়াতে, সূরা ফাতিরের ১৩ নং আয়াতে এবং সূরা জুমার ৫ নং আয়াতে। কুরআন আল্লাহর বাণী না হলে ১৪০০ বছর পূর্বের কোনো বড় পণ্ডিতের জন্য এটা বলা সম্ভব ছিল? আর আজকের দিনে বিজ্ঞান সেই ১৪০০ বছর পূর্বের কথাই স্বীকার করে নিলো যে, মহাশূন্যের সবকিছুই ঘোরে ও চলে।

৫ নং যুক্তি ঃ সূরা মুরসালাতের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–'আমি পৃথিবীকে মহাশূন্যে এক শক্তিবলে সামনে রাখার ব্যবস্থা কি করিনি?' আর সূরা আল-মূলকে আল্লাহ বলেছেন, তিনি পৃথিবীর ভূ-তলকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তোমরা এর সব জায়গা দিয়ে চলা-ফেরা করতে পারো।

এর দ্বারা 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' বুঝায় যার কারণে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই ভূ-তল পায়ের নিচে থাকে, যার জন্য সর্বত্রই চলা-ফেরা করতে পারি। কুরআন নাযিলের পূর্বে এ কথা কেউ কি বলতে পেরেছিল?

৬ নং যুক্তি ঃ আল-কুরআনের সূরা আর-রাহমানের ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সমুদ্রের ভিতর থেকে মণি-মুক্তা ও প্রবাল বের হয়। ১৪০০ বছর পূর্বে এ কথা কে বলতে পেরেছিল?

৭ নং যুক্তি ঃ সূরা আল-বাকারার ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে বৃষ্টির সাথে থাকে ঝড়-তুফান, বিজলীর চমক ও মেঘের ডাক। মানুষ এগুলো ছাড়াই বৃষ্টি চায়, কিন্তু এগুলো ছাড়া বৃষ্টি হয় না। সূরা রা'দের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–'বিজলীর মধ্যে ভয়েরও কারণ আছে এবং ভরসারও কারণ আছে।' এই ভরসাটা কি? এটাই হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে রক্ষিত নাইট্রোজেন গ্যাস যা বিদ্যুৎচমকের মাধ্যমে নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে। এভাবেই আল্লাহ অনুর্বর জমিনকে উর্বর

www.pathagar.com

করে গড়ে তোলেন। আল্লাহর ভাষা হচ্ছে– 'ফা আহইয়া বিহিল আরদা বা'দা মাওতিহা।' অর্থাৎ 'এভাবেই আমি অনুর্বর জমিনকে উর্বর করে গড়ে তুলি।' এই ধরনের আয়াত কুরআন শরীফের ৫ জায়গায় রয়েছে। যথা ঃ সূরা আল-বাকারার ১৬৪ নং আয়াত, সূরা আর-রূমের ৬৪ ও ৬৫ আয়াত, সূরা আল-আনকাবুতের ৬৩ নং আয়াত, সূরা আন-নামলের নং আয়াত। এ কথা ১৪০০ বছর আগে কে বলতে পেরেছিল যে, গাছের খোরাক নিয়ে বৃষ্টিপাত হয়?

৮ নং যুক্তি ঃ কুরাআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কে বলতে পেরেছিল যে, আসমান ও জমিন পূর্বে একত্রে মিলিত ছিল। এরও পূর্বে ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী ছিল। আর যে মানুষটি কোনোদিন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে দুটো হরফও পড়াশোনা করেননি তিনি কি করে নিজের থেকে এসব কথা বলতে পারেন–যা আজ বিজ্ঞান স্বীকার করছে?

৯ নং যুক্তি ঃ সম্প্রতি মিশরের এক তরুণ বিজ্ঞানীর পরীক্ষায় ধরা পড়লো আল্লাহ যে عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ বলেছেন অর্থাৎ 'এর উপর আমি উনিশ সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি' সেই উনিশের উপর গবেষণা করে তিনি দেখলেন 'আল-কুরআন' আরবীতে লিখতে অক্ষর লাগে ছয়টি আর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে অক্ষর লাগে ১৯টি। এই ৬×১৯ =১১৪। এই ১১৪টি হচ্ছে আল-কুরআনের সূরার সংখ্যা। আর পরীক্ষায় ধরা পড়লো আল-কুরআনের অক্ষরের সংখ্যার সঙ্গে ১৯-এর সম্পর্ক।

দেখা গেল যেসব সূরার প্রথমে 'হরফে মুকাত্তায়াত' বা কাটা কাটা অক্ষর আছে, যেমন– طٰهٰ - قٓ - الٓمٓ - يٰسٓ ن ইত্যাদি মুকাত্তায়াত হরফগুলি সূরার মধ্যে যতবার আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন উদাহরণ স্বরূপ যে সূরা ن দ্বারা শুরু হয়েছে তার মধ্যে নুন যতবার আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যে সূরা ق দ্বারা শুরু হয়েছে সে সূরায় যতবার ق আছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এমন সৃষ্টি কি পৃথিবীর কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব?

সাম্প্রতিককালে কম্পিউটার নাকি বলেছে যে, কেউ যদি সতর্কতা ও সচেতনতার সঙ্গে লিখতে থাকেন তাহলে ৬২৬, ০০০,০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০,০০০ বার লিখলে হয়ত ঘটনাচক্রে একবার একখানা কুরআন শরীফ লেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এতবার লেখা কি একটি জীবনের পরিসরে সম্ভব? বরং কতগুলো জীবন একত্র করে যদি একা কয়েক হাজার বছরের হায়াত নিয়ে আসতে পারে তাহলে হয়ত সম্ভব হতো। কিন্তু

www.pathagar.com

এটা কি মানব জীবনের জন্য সম্ভব? অথচ রাসূল (সা) একবারই মাত্র মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন, আর তাতেই মিলে গেল এভাবে ১৯-এর হিসাব। এটাই তো আল-কুরানের মো'জেযা।

১০ নং যুক্তি ঃ আজ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা যতবড় পণ্ডিতই হোন না কেন, কেউই আল-কুরআনের একটি কথাকেও অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করতে পারেননি। ব্যস, এতটুকু প্রমাণই যথেষ্ট যে, আল-কুরআন সত্যিই 'আল্লাহর বাণী' এবং যার মাধ্যমে আল-কুরআন পাওয়া গিয়েছে তিনি সত্যিই 'আল্লাহর নবী'।

আশা করা যায় পৃথিবীর মানুষ যতই এর উপর চিন্তা-ভাবনা করবে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝার চেষ্টা করবে ততই মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং এই বিজ্ঞান ও দর্শনের চরম উন্নতির যুগে কেউ আর অন্ধকারে থাকবে না।

আল্লাহ তৌফিক দিন আমাদের সকলকে, যেন আমরা সবাই সত্যকে 'সত্য' বলে মানতে পারি এবং সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে পরকালের নাজাতের পথ ধরতে পারি। এবার আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে মানুষের স্বার্থেই পরকাল হতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষের দাবিতেই পরকাল

পরকাল যে সত্যিই হবে তার যুক্তি

১ নং যুক্তি ঃ মানুষ সাধারণতঃ দুটো কারণে মিথ্যা বলে। যথা ঃ ১. কোনো না কোনো লাভ বা স্বার্থের বশীভূত হয়ে অথবা ২. কোনো না কোনো ভয়ের কারণে। এ দুটো জিনিস যখন কারো সামনে থাকে না তখন সে সত্য কথাই বলে, এটাই মানবপ্রবৃত্তি।

আমরা দেখি, দুনিয়ার নবী-রাসূলগণ সবাই বলেছেন পরকাল হবে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই এমন ছিলেন যে, কোনো ধরনের লোভ বা ভয় তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং তাঁরা যখন সবাই একই কথা বলেছেন তখন অবশ্যই তা মিথ্যা হতে পারে না।

www.pathagar.com

২ নং যুক্তি ঃ যা সত্য সাক্ষ্য তা যত মানুষই (সাক্ষ্য) দিক না কেন, প্রত্যেকের কথা একই ধরনের হয়। আর যা মিথ্যা সাক্ষ্য তা কখনো একটার সাথে অন্যটার মিল হয় না। যেমন একই অংকের সঠিক উত্তর প্রত্যেকের একই ধরনের হয়, কিন্তু ভুল উত্তর কখনো একটার সাথে অন্যটার মিল হয় না।

এই যুক্তি অনুযায়ী দেখা যায় সকল নবীই আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত এবং পরকাল সম্পর্কে হুবহু একই কথা বলেছেন, যদিও তারা বহু যুগ বা শতাব্দীর ব্যবধানে পৃথিবীতে এসেছেন। কারো সাথে কারো দেখা হয়নি অথচ তাঁরা একই কথা বলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একথা মিথ্যা হলে সবার কথা একই ধরনের হতে পারতো না।

৩ নং যুক্তি ঃ আল্লাহতে বিশ্বাসীগণ আমরা আল্লাহকে এভাবে পেয়েছি যে, যা-ই আমাদের প্রয়োজন তা-ই তিনি দেন। আর যা-ই আমাদের মনের মৌলিক দাবি তা-ই তিনি পূরণ করেন। এর ব্যতিক্রম আমরা পাইনি। আরো লক্ষ্য করা গেছে যে, আল্লাহ সব-ই দেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনের পূর্বে দেন না। যেমন শিশুকালে যখন দুধের প্রয়োজন ছিল তখন মায়ের স্তনে দুধ দিয়েছেন। কিন্তু যতদিন দুধ খেঁয়েই বাঁচতে হয় ততদিন আল্লাহ দাঁত দেন না।

যদি ঐসময় কেউ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতো যে, আল্লাহ তুমি সবাইকে দাঁত দিয়েছো, আমাকে কেন দিলে না? তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার জবাব হতো এইরকম যে, তোমাকে দাঁত অবশ্যই দেয়া হবে যখন তোমার চিবিয়ে খাবার প্রয়োজন হবে। এখন দুধ চুষে খাবার সময় যদি তোমাকে দাঁত দেই তাহলে তোমার মায়ের স্তনে কামড় লেগে যেতে পারে। এতে তোমার মায়ের কষ্ট হবে, তাই এখন তোমাকে দাঁত দেইনি। কিন্তু প্রয়োজনমতো অন্যেরা যেমন দাঁত পেয়েছে তেমনি তুমিও দাঁত পাবে। দাঁত আমরা এভাবেই পেয়েছি। আর এটাই হলো আল্লাহর সবকিছু দেয়ার বিধান। অর্থাৎ মানুষের জন্য যখন যা দরকার আল্লাহ তখনই তা দিয়ে থাকেন।

শুধু মানুষের জন্য নয়, আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুরই টিকে থাকার জন্য যখন যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু দেয়াই আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধান। এবার আসুন একটু যাচাই করে দেখি যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির চাহিদা কিভাবে পূরণ করেন।

www.pathagar.com

সৃষ্টির চাহিদা পূরণই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান

দেখুন মানুষকে আল্লাহ হিকমত দিয়েছেন যা কাজে লাগিয়ে তারা শীতবস্ত্র তৈরি করে এবং তা দিয়ে শীত নিবারণ করে। কিন্তু জীব-জানোয়ারকে আল্লাহ যেহেতু কাপড়, লেপ-কাঁথা তৈরির হিকমত দেননি তাই তাদের গায়ে দিয়েছেন ঘন পশম। আর পশমকে আল্লাহ করেছেন তাপ অপরিবাহী। যার ফলে প্রতিটি প্রাণীর গায়ের গরমে পশম গরম হয়, আর পশম তাপ পরিবহণ ক্ষমতা রাখে না বলে পশমের তাপ ছুটে যেতে পারে না। তা গরম অবস্থাতেই থাকে। সেই গরমে তাদের শীতবস্ত্রের কাজ হয়ে যায়। এভাবে পাখির পালক তার পোশাকের কাজ করে। আবার দেখি নাতিশীতোষ্ণ দেশের পশুর চেয়ে শীতপ্রধান দেশের পশুর গায়ের পশম ঘন এবং লম্বা। এর কারণ ঐ একটাই যে, আল্লাহ তার শীতবস্ত্রের চাহিদা পূরণ করেছেন। এভাবে উই পোকাকে আল্লাহ চোখ দেননি তাই তার খাদ্য করেছেন তা-ই যা তার সামনে পড়বে। সে শক্ত কাঠ খেয়ে হজম করে ফেলবে যা মানুষ পারবে না।

আবার দেখুন শীতের মৌসুমে ঠাণ্ডা পানির মধ্যে মাছ বাস করে, তাদের ঠাণ্ডা লাগে না, কাশি হয় না, নিউমোনিয়াও হয় না। কিন্তু আমরা ঐ পানিতে নামতেই পারি না। এটাই আল্লাহর সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বিধান।

এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴾

অর্থ ঃ তোমরা কখনো আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল আল্লাহর বিধানই হচ্ছে এই যে, তিনি যা-ই সৃষ্টি করেছেন তারই টিকে থাকার জন্য যা চাহিদা তা তিনি যথাসময়ে পূরণ করে থাকেন। আমরা এ বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করলে খুঁজে পাবো একটা সূত্র। সে সূত্র হচ্ছে এই যে, যা-ই তাঁর (আল্লাহর) সৃষ্টির দাবি তাই তিনি পূরণ করেন। এই সূত্রের যথার্থতা আমরা দেখি প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর এই সূত্র অনুযায়ী মানব মনের একটা বড় মৌলিক দাবি হচ্ছে ভালো কাজের জন্য ভালো ফল এবং মন্দ কাজের জন্য মন্দ ফল পাওয়া। তা অবশ্যই আল্লাহ পূরণ করবেন।

কিন্তু দুনিয়ায় দেখছি এ দাবি পূরণ হচ্ছে না। আর দেখছি মানব মনের আরো একটা দাবি পূরণ হচ্ছে না, সেটা হলো পাপ-পুর্ণের পরিমাপযন্ত্র

www.pathagar.com

অর্থাৎ এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার হলে ভালো হতো, যে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ বলে দিতে পারতো যে, কে কতটুকু পাপী আর কে কতটুকু পুণ্যবান অর্থাৎ কার কি পরিমাণ শাস্তি হওয়া উচিত আর কার কি পরিমাণ পুরস্কার পাওয়া উচিত। কিন্তু এ ধরনের কোনো যন্ত্র এখনো আবিষ্কৃত হচ্ছে না।

কেন তা হচ্ছে না? এর কারণ হলো আল্লাহর বিধানই হচ্ছে যে, সবকিছু পাওয়ার জন্য একটা উপযুক্ত সময় আসতে হবে। যেমন দাঁতের বয়স না হলে দাঁত পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি পাপ পুণ্যের পরিমাপযন্ত্র তখনই পাওয়ার কথা যখন পাপ আর পুণ্য নতুন করে হতে পারবে না। আর যতদিন পর্যন্ত পাপ আর পূর্ণ হতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সঠিক মাপ আসতে পারবে না। তাই যেদিন পাপ-পুণ্য খাতায় জমা হবে না বা আমলনামায় লেখা বন্ধ হয়ে যাবে সেদিনই পরিমাপযন্ত্র 'মিজান' আল্লাহ দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে, যে লোকটা মরে গেছে তার তো পাপ-পুণ্য বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে তা হয়নি। আল্লাহ বলেন ঃ

نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط

অর্থ ঃ আমি লিখছি ও লিখতে থাকবো যা তারা পূর্বে বেঁচে থাকা অবস্থায় করেছে আর যা তাদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া। (সূরা ইয়াসীন ঃ ১-২)

অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি কোনো ভালো কাজ করে তবে মরে গেলেও তার সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয়, যেটাকে বলা হয় 'সদকায়ে জারিয়া'। আর বেঁচে থাকাবস্থায় যদি গোনাহের কাজ জারি করে যায়, যেমন ধরুন একটা 'সিনেমা হল' কেউ তৈরি করে গেল, তার মৃত্যুর পর ঐ সিনেমা হলে যত গোনাহর কাজ হতে থাকবে তার সমতুল্য গোনাহ ঐ হলের প্রতিষ্ঠাতার নামে জমা হতে থাকবে। আর এটা বন্ধ হবে তখনই যখন পৃথিবী ফানা হয়ে যাবে। কোনো মসজিদও থাকবে না, কোনো সিনেমা হলও থাকবে না। সেইদিন সওয়াব লেখাও বন্ধ হবে এবং গোনাহ লেখাও বন্ধ হবে। এরপর ঐ দুটো চাহিদা পূরণের জন্য ভিন্ন পদ্ধতির এক নতুন জগৎ সৃষ্টি হবে। যেখানকার জীবন হবে চিরস্থায়ী জীবন। যে জীবনে শাস্তি ও পুরস্কার ভোগ করার মতো উপযুক্ত সময় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর বোমা ফেলে যে লোকটি এক মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানবসন্তানকে মেরে ফেললো তাকে উপযুক্ত শাস্তি

www.pathagar.com

দিতে হলে তাকে হাজার হাজার বার হত্যা করা দরকার। কিন্তু এই পৃথিবীর জীবনে যেখানে একটা মানুষকে মাত্র একবারই মেরে ফেলা যায় সেখানে একাধিক ব্যক্তির হত্যাকারীকে উচিত শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। তাই মানব মনের দাবি হচ্ছে এই যে, এমন একটা চিরস্থায়ী জীবন দিতে হবে যেখানে একাধিক ব্যক্তির হত্যাকারীকে একাধিক বার হত্যা করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যারা এ পৃথিবীর উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের ভালো করতে গিয়ে চরম জুলুম-নির্যাতন ভোগ করেছেন তাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া যায় এবং সে পুরস্কার ভোগ করার মতো একটা দীর্ঘ সময়ও তাকে দেয়া হোক। মানুষের মনের এই মৌলিক দাবি পূরণ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবেন। আর তা যদি আল্লাহ না-ই দেন তবে তিনি 'ন্যায় বিচারক' হিসেবে গণ্য হতে পারেন না।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল পরকাল হতে হবে মানুষের প্রয়োজনেই। সুতরাং তা আল্লাহ দিতে ওয়াদা করেছেন যেন তিনি ন্যায় বিচার করতে পারেন এবং তা কার্যকর করতে পারেন।

উপসংহার

মানুষের মগজের অবস্থা এমন যে, তাকে একটা রেডিও সেটের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যেমন রেডিওর মিটার যে সেন্টারের সঙ্গে জুড়ে দিবেন সেই সেন্টার থেকে সংবাদ আসতে থাকবে। ঠিক তেমনি আপনি যে বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করবেন সে বিষয়ের জ্ঞান আপনার মগজে আসতে থাকবে।

আপনি যখন পদ্মানদী থেকে ইলিশ মাছ ধরার পন্থা সম্পর্কে চিন্তা করবেন তখন কি আর্কিমিডিসের সোনা মাপার থিওরী আপনার মগজে ধরা পড়বে? তা যেমন পড়ে না তেমনি আপনি যখন চিন্তা করবেন লেনিনবাদ-মার্কসবাদ বা মাওবাদের উপর তখন কি আর আপনার মগজে আল্লাহর অস্তিত্ব ধরা পড়বে?

আপনার মগজের মিটারটাকে আরশে মুয়াল্লার সঙ্গে জুড়ে দিন, দেখবেন সেখান থেকে আপনার মগজে অনেক খবর আসতে থাকবে এবং আমি আশা করি আমার চেয়ে আপনার মগজে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন আরো বেশি ধরা পড়বে।

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। ❐

www.pathagar.com

খন্দকার প্রকাশনী

বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Maa Design